হিমালয়ের স্বপ্ন

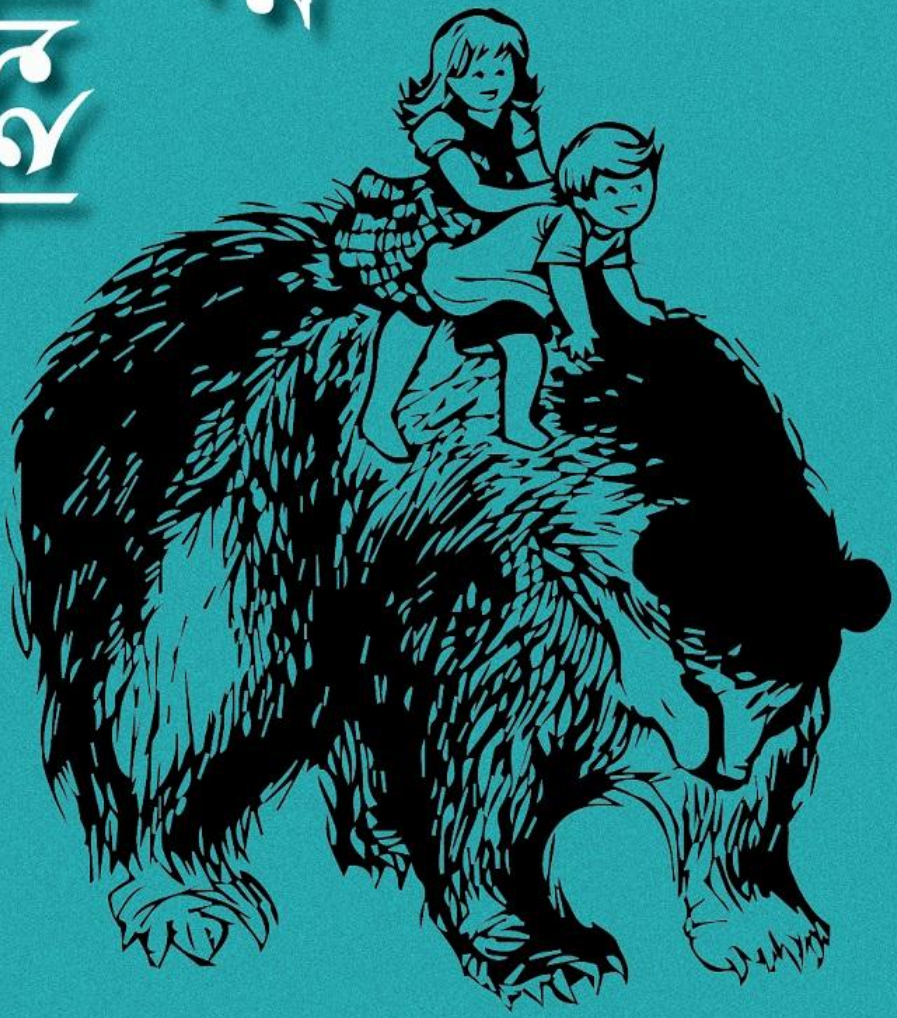

হেমেন্দ্রকুমার রায়

হিমাচলের স্বপ্ন

হেমেন্দ্রকুমার রায়

eBook Created By: **Sisir Suvro**

প্রচ্ছদ: **Sisir Suvro**

Need More Books!

Gooo...

www.shishukishor.org

www.amarboi.com

www.banglaepub.com

www.boierhut.com/group

পথের নেশা

একদিন এক খোকাবাবু তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁ বাবা, এ কে?

খোকার বাবা বললেন, 'ভাল্লুক'।

খোকার মুখ দিয়ে বোধহয় 'ক' বেরুল না। সে নিজের ভাষায় সংশোধন করে নিয়ে বললে 'ভাল্লু।'

সেইদিন থেকে সবাই তাকে 'ভাল্লু' বলে ডাকতে আরম্ভ করলে।

ভাল্লু জন্মেছিল হিমালয়ের জঙ্গলে, সুতরাং বুঝতেই পারছ, সে হচ্ছে রীতিমত বড়-ঘরের ছেলে। ভাল্লুক বংশে যারা কুলীন বলে মর্যাদা পায়, তাদের সকলেরই জন্ম গিরিরাজ হিমালয়ের কোলে।

ভাল্লু যখন মায়ের দুধ ছাড়েনি, সেই সময়ে হঠাৎ সে এক শিকারীর হাতে ধরা পড়ে। তারপর শিকারী তাকে যার কাছে বেচে ফেলে, তার ব্যবসা ছিল ভাল্লুক আর বাঁদরের খেলা দেখানো। তার কাছ থেকে ভাল্লুও নানানরকম খেলা শিখলে—এমন কি ওরিয়েন্টাল ডান্স পর্যন্ত। লোকে তার বুদ্ধি আর খেলার কায়দা দেখে বাহবা দিত ঘন ঘন।

তা ভাল্লু যে বিশেষ বুদ্ধিমান হবে, এটা খুব আশ্চর্য কথা নয়। তার অমর ও ভারতবিখ্যাত পূর্বপুরুষ ভল্লুকরাজ জাম্ববানের নাম কে না জানে? জাম্ববান ছিলেন বানররাজ সুগ্রীবের প্রধানমন্ত্রী এবং অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ-সভার একজন প্রধান সভ্য। জাম্ববানের বীরত্ব, সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং কুস্তি লড়বার ও চপেটাঘাত করবার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত তাঁর জামাই না হয়ে পারেননি।

যে লোকটা ভাল্লুক নিয়ে দেশে দেশে খেলা দেখিয়ে বেড়াত হঠাৎ সে মারা পড়ল। চার বছর বয়সে ভাল্লু বেচারি হল আবার অনাথ। সেই সময়ে কে তাকে নিয়ে গিয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় ভর্তি করে দেয়। আজ এক বছর সে চিড়িয়াখানায় বাস করছে ।

কিন্তু চিড়িয়াখানা তার মোটেই পছন্দ হত না। বরাবর দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়ানো তার অভ্যাস, এইটুকু একটা লোহার রেলিংঘেরা কুঠুরির ভিতরে দিন-রাত অলসের মতন বসে থাকতে তার ভালো লাগবে কেন? বিশেষ, ভাল্লু হচ্ছে একটি বড় দরের আর্টিস্ট। কত কষ্ট করে সে দুর্লভ নৃত্যবিদ্যা শিখেছে— অথচ এখানে কেউ তাকে ডুগডুগি বাজিয়ে নাচ দেখাতে বলে না। মাঝে মাঝে নাচবার জন্যে তার পা দুটো নিসপিস করে উঠত, কিন্তু সঙ্গতের অভাবে তার ইচ্ছা হত না পূর্ণ।

রোজই খোকা-খুকির দল তার ঘরের সামনে এসে কৌতুহলে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকত। ভাল্লু রেলিংয়ের কাছে গিয়ে নিজের ভাষায় বলত, 'ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ!' অর্থাৎ—'হে খোকা-খুকিগণ, তোমরা কেউ একটা ডুগডুগি নিয়ে আসতে পার?

কিন্তু মামুষের ছেলে-মেয়ের। ভল্লুক-ভাষা বুঝতে পারত না, তারা ভাবত সে বোধহয় খাবার-টাবার কিছু চাইছে। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে খাঁচার ভিতরে এসে পড়ত কলা বা ছোলা বা অন্য কোনরকম শস্তা দামের ফলমূল।

ভাল্লু দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবত, মানুষদের ছেলে-পুলের আর্ট বোঝে না, ললিতকলার চেয়ে চাঁপাকলার দিকেই তাদের বেশী টান ।

মাঝে মাঝে তার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ত। সেই বিরাট হিমালয়! তুষার-মুকুট উঠেছে তার নীলাকাশের অসীমতায়, শিখরের পর শিখরের আশপাশ

দিয়ে সাদা সাদা মেঘের ভেসে যাচ্ছে তাকে প্রণাম করে। নীচের দিকে তুলছে তার গভীর অরণ্যের সবুজ অঞ্চল—সেখানে মিষ্টি গান গাইছে কত পাখি, আতরের ভুরভুরে গন্ধ বিলিয়ে দিচ্ছে কত ফুল, রংচঙে টুকরো উড়ন্ত ছবির মতন ঘোরাফেরা করছে কত প্রজাপতি। জঙ্গলের বুকের ভিতরে আলো-আঁধার-মাখা রহস্যময় স্বপ্নপুর, তারই মধ্যে ছিল তার সুখের বাসা।

ভাল্লু একদিন খাঁচার এক কোণে উপুড় হয়ে শুয়ে এইসব কথা ভাবছে, এমন সময় তার রক্ষক এসে খাঁচার দরজা খুললে।

ভাল্লু মানুষদের অত্যন্ত পোষ মেনেছিল। তার চেহারা ছিল প্রকাণ্ড এবং তার লম্বা লম্বা দাঁত-নখ দেখলে সকলেই ভয় পেত বটে, কিন্তু যারা তাকে চিনত তারা বলত, ভাল্লুর মেজাজ খরগোসের চেয়েও ঠাণ্ডা। সে কোনদিন পালাবার চেষ্টা করেনি, কারুকে তেড়ে যায়নি, বা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ধমক দেয়নি। কাজেই রক্ষক প্রায়ই খাঁচার দরজা বন্ধ না করেই নিজের কাজকর্ম সারত।

ভাল্লুর বাসা ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে উপরে ছাদ ছিল না—তিন পাশে ছিল কেবল লোহার রেলিং। যেদিকে রেলিং ছিল না সেইদিকে ছিল একটি ছোট ঘর রাতের বেলায় ভাল্লু এই ঘরে ঢুকে শুয়ে শুয়ে দেখত হরেকরকম স্বপ্ন।

ভাল্লু যে রেলিংয়ের পাশে উপুড় হয়ে ছেলেবেলার স্বাধীনতার কথা ভাবছে, রক্ষক সেটা আন্দাজ করতে পারলে না। সে ভিতরের ঘরটা ঝাঁট দিতে গেল।

খানিক পরে ঘর ঝাঁট দিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে দেখে, খাঁচার ভিতরে ভাল্লু নেই। তাড়াতাড়ি খাঁচার খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়েও সে ভাল্লুকে দেখতে পেলে না।

খিদিরপুরের দিকে চিড়িয়াখানায় ঢোকবার যে ছোট দরজা আছে, ভাল্লু ততক্ষণে সেইখানে গিয়ে হাজির হয়েছে।

চিড়িয়াখানার দুইজন কর্মচারী দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ তারা দেখলেন একটা মস্ত বড় ভীষণ ভাল্লুক ছুটতে ছুটতে তাদের দিকেই আসছে ।

সে-অবস্থায় প্রত্যেক ভদ্রলোকের যা করা উচিত, তারা তাই-ই করলেন—অর্থাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে এক এক লাফ মেরে দরজার বাইরে গিয়ে পড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পথ খোলা পেয়ে ভাল্লু একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। আজ এক বছর রাস্তায় বেরিয়ে ভাল্লুর মনে আনন্দ আর ধরে না। এমনি কত রাস্তায় সে কত না খেলা দেখিয়েছে—আহা, রাস্তা চমৎকার জায়গা! সে আবার ধুলোয় শুয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

একটি ফিটফাট মেম নাক শিকেয় তুলে চিড়িয়াখানার দিকে আসছিল। হঠাৎ মেমের সন্দেহ হল, তার নাকের ডগায় ধুলো লেগেছে। সে তখনই দাঁড়িয়ে পড়ে ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর থেকে বার করলে পুঁচকে আরসি ও পাউডারের তুলি। তারপর একহাতে আরসি ও আর একহাতে তুলি ধরে নাকের ডগায় পাউডার মেখে সে চোখ নামিয়ে দেখলে এক অসম্ভব দুঃস্বপ্ন।

ভাল্লু আজ পর্যন্ত কোন মানুষকে নাকের ডগায় পাউডার ঘষতে দেখেনি। সে মেমের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে তার মুখের পানে তাকিয়ে ছিল।

ঠিকরে পড়ল মেমের হাত থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ, পাউডারের তুলি ও সৌখীন আয়না। বিকট এক আর্তনাদ, এবং মূর্ছিত মেমসায়েব পপাত ধরণীতলে।

এদিকে এক মিনিটের মধ্যে রাস্ত জনশূন্য । একদল পথের কুকুর ঘেউঘেউ করে এগিয়ে এল। কিন্তু ভাল্লু একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই তারা ল্যাজ গুটিয়ে চম্পট দিলে।

আগেই বলেছি, ভাল্লু হচ্ছে বুদ্ধিমান জাম্ববানের বংশধর। হনুমানের বংশধর হয় হনুমান, জাম্ববানের বংশধরই বা জাম্ববান হবে না কেন? কাজেই তার বুঝতে বিলম্ব হল না যে, চিড়িয়াখানার লোকেরা এখনি তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে ছুটে আসবে।

কিন্তু সে আর চিড়িয়াখানায় ফিরে যেতে রাজি নয়। আজ সে হিমালয়ের স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন দেখেছে। আজ পেয়ে বসেছে তাকে পথের নেশা—পথের পর পথ, তারপর আবার পথ, নূতন নূতন দেশ আর পথ, পথ আর দেশ। তারপর সে হয়ত আবার খুঁজে পাবে তার সেই দূর-দূরান্তরে হারিয়ে-যাওয়া কত সাধের হিমালয়কে। এখন, কেমন করে মানুষদের চোখে ধুলো দেওয়া যায়? ভাল্লু এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখলে, কেউ কোথাও নেই। মেমসায়েব শুয়ে শুয়ে একবার চোখ তুলে তাকিক্ষেতাকে দেখেই আবার প্রাণপণে চোখে মুদে ফেললে।

সামনেই ছিল একটা মস্তবড় ঝুপসি গাছ। ভাল্লু চটপট গাছে চড়ে ঘন পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাহসিনী মিসেস, দস্তিদার

দিব্য ব্ল্যাক-আউটের রাত। আকাশে একফালি চাঁদ আছে বটে, কিন্তু নামে মাত্র। চারিদিকের গাছপালা ও ঘরবাড়ী প্রভৃতিকে দেখাচ্ছে কালো পটে আরো কালো কালি দিয়ে আঁকা ঝাপসা ছবির রেখার মত।

কনস্টেবল হনুমানপ্রসাদ পাঁড়ে রাস্তার ধারে একটি ভালো রোয়াক পেয়ে শুয়ে পড়ে মস্ত মস্ত মর্তমান কদলী কিংবা ছাতু মুন ও কাঁচালঙ্কার স্বপ্ন দেখছিল নির্বিঘ্নে ।

হঠাৎ তার মুখের উপরে লাগল যেন একটা ঝড়ের ঝাপটা। স্বপ্ন হল অদৃশ্য, নাসাগর্জন হল বন্ধ এবং তার বদলে দেখা গেল অন্ধকারেরও চেয়ে অন্ধকার ও প্রকাণ্ড কি যেন একটা বিদঘুটে ব্যাপার। তারই মধ্যে জ্বলছে আবার দু-দুটো আগুনের গুলি ।

এও স্বপ্ন নাকি? কিন্তু এ-রকম স্বপ্ন হনুমানপ্রসাদ পছন্দ করত না। সে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে চোখ পাকিয়ে দেখলে, একটা রীতিমত সচল অন্ধকার তার সামনে দাঁড়িয়ে হেলছে এবং দুলছে । আর সে অন্ধকারটা যেন কেমন একরকম বোটুকা গন্ধের এসেন্স মেখে এসেছে।

ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছ কি? চতুর্দিক নিঃসাড় ও নিরাপদ দেখে আমাদের ভাল্লু বৃক্ষের আশ্রয় ছেড়ে মৃত্তিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং হমুমানের নাসিকার হুঙ্কার শুনে সাগ্রহে ঘ্রাণ নিয়ে জানতে এসেছে, এ আবার কোন দুষ্ট জানোয়ার তাকে দেখে কি টিটকারি দিচ্ছে ।

ম্লান আলোয় হনুমান সঠিক রহস্য উপলব্ধি করতে পারলে না বটে, কিন্তু আন্দাজে এটুকু বেশ বুঝতে পারলে যে, তার সামনে যে আবির্ভূত হয়েছে সে একটা মূর্তিমান বিভীষিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হনুমান যখন ঠকঠক করে কাঁপতে আরম্ভ করলে তখন তাকে আশ্বাস দেবার জন্যে ভাল্লু একবার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল।

পর-মুহূর্তে হনুমান পাঁড়ে রোয়াকের উপর থেকে এমন এক সুদীর্ঘ লম্ফ ত্যাগ করলে যে আসল হনুমানরা পর্যন্ত তা দেখলে দস্তুরমত অবাক হয়ে যেত। তারপরই এক-মাইলব্যাপী বিকট চীৎকার— বাপ রে বাপ, জান গিয়া রে জান গিয়া?

ভাল্লু, মাথা খাটিয়ে বুঝলে, এই চীৎকারের ফল ভালো হবে না। এখনি এ মুল্লুকের যত মানুষ ঘটনাস্থলে তদারক করতে আসবে এবং তারপর আবার গলায় পড়বে দড়ি। ভাল্লু তার চারখানা পা যতটা পারে তাড়াতাড়ি চালিয়ে একদিকে ছুটতে সুরু করলে।

দৌড়, দৌড়, দৌড় । উত্তরদিকে দৌড়তে দৌড়তে হনুমান পাঁড়ে বারংবার পিছনপানে তাকিয়ে দেখছে সেই অগ্নিচক্ষু অন্ধকারটা তাকে গ্রাস করবার জন্যে এখনো পিছনে পিছনে আসছে কি না এবং দক্ষিণ দিকে দৌড়তে দৌড়তে ভাল্লু বারংবার পিছনপানে তাকিয়ে দেখছে, তার হিমালয়ের স্বপ্নে বাদ সাধবার জন্যে মানুষেরা দড়ি নিয়ে বোঁ-বোঁ করে ছুটে আসছে কি না। তাদের দু-জনেরই দৌড় দেখে বোঝা শক্ত, কে বেশি ভয় পেয়েছে।

পাহারাওয়ালা কত দূরে গিয়ে দৌড় থামালে জানি না, কিন্তু ভাল্লু আধঘণ্টার পর একটি নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপ ছাড়তে লাগল।

তখন রাত এসেছে ফুরিয়ে। পূর্ব-আকাশে কে যেন কালোর সঙ্গে গুলে দিচ্ছে আলোর রং । ভোর হতে আর দেরি নেই দেখে ভাল্লু আবার একটা খুব উঁচু ও ঝাঁকড়া গাছ বেছে নিয়ে তড় তড়, করে তার উপরে উঠে ঘন পাতার আড়ালে মিলিয়ে গেল। একদল কাক আর শালিক পাখি তখন সবে জেগে উঠে প্রভাতী রাগিণী ভাঁজবার আয়োজন করছিল, আচমকা দুঃস্বপ্নের মতন তাদের মধ্যিখানে ভাল্লুর আবির্ভাব দেখেই তারা বেসুরো চীৎকার করে যে যেদিকে পারলে উড়ে পালাল ।

ভাল্লু মনে মনে বললে, পাখিগুলো কেন যে আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ওরে কাক, ওরে শালিকের দল, তোরা আবার বাসায় ফিরে আয় । আমি যে পরম বৈষ্ণব, মাছমাংস স্পর্শ করি না। তার উপরে আমি দেখেছি হিমাচলের সুন্দর স্বপন—আমার মন ছুটছে এখন অনন্ত হিমারণ্যের শীতল স্তব্ধতার দিকে, সেই যেখানে ঝরে তুষারের ঝরনা, বুনো বাতাস আনে অজানা ফুলের গন্ধ, গাছে গাছে ফলে থাকে পাকা পাকা মিষ্টি ফল। আজ আমি স্বাধীন, আজ আমি দেশে চলেছি, আজ কি আমি জীব-হিংস। করতে পারি?...ভাল্লু ঠিক এই কথাগুলোই ভাবছিল কিনা হলপ করে আমি বলতে পারি না, এসব আন্দাজ মাত্র। তবে সে কিছুনা-কিছু ভাবছিল নিশ্চয়ই, এবং চার পা দিয়ে গাছের একটা মোটা ডাল জড়িয়ে ভাবতে ভাবতে ভোরের ফুরফুরে হাওয়ায় কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল।.

বেশ খানিকক্ষণ পরে তার ঘুম গেল ভেঙে। পিট পিট করে চোখ মেলে নীচের দিকে তাকিয়ে সে দেখলে একটা দৃশ্য।

একটি বাগান। ভাল্লুর গাছটা বাগানের পাঁচিলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তার আধাআধি ডালপাল শূন্যে বাগানের ভিতরদিকেও ছড়িয়ে

পড়েছে। ভাল্লু যে মোটা ডালটাকে অবলম্বন করেছে সেটা আবার বেঁকে নেমে গিয়েছে বাগানের জমির কাছাকাছি ।

সেদিন রবিবার। কলকাতার কোন মেয়ে-ইস্কুলের একদল ছাত্রী সেই বাগানে এসেছে বনভোজনে।

দশটি মেয়ে-বয়স তাদের বারে-তেরো থেকে পনেরো-ষোলোর মধ্যে! সঙ্গে চারজন শিক্ষয়িত্রীও আছেন।

প্রধান শিক্ষয়িত্রী হচ্ছেন মিসেস দস্তিদার। শুকনো ও লিকলিকে সরল কাঠের মতন তার দেহ–মাথায় উঁচু সাড়ে-পাঁচ ফুটেরও বেশী। পুরুষই হোক আর মেয়েই হোক, এ-রকম রোগা চেহারায় যা সুলভ নয়, মিসেস দস্তিদার ছিলেন সেই বেজায় ভারিক্কে ভাবের অধিকারিণী। চশমা-পরা চোখে কড়া চাহনি, এবং একজোড়া পুরু ঠোঁটের উপরে উল্লেখযোগ্য একটি গোঁফের রেখা। মেয়েদের ভিতরে একবার প্রশ্ন উঠেছিল, জীবনে হাসেনি এমন কোন মানুষের অস্তিত্ব আছে কি না? উত্তরে একটি মেয়ে বলেছিল, 'আছে। তার নাম মিসেস্ দস্তিদার।

তা মিসেস দস্তিদারের মুখে হাসির অভাব হলেও বাক্যের অভাব হয়নি কোনদিন। তার মুখে সর্বদাই ফোটে কথার তুবড়ি এবং এ তুবড়ি মৌন হয় না এক মিনিটও। তার বাক্যের স্রোত বস্তার মত ভেঙে পড়ে শ্রোতাদের কর্ণকুহরকে অভিভূত করে দেয় এবং খানিকক্ষণ তাঁর কাছে থাকতে বাধ্য হলে প্রত্যেক শ্রোতাই মনে মনে বলতে থাকে—ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। মিসেস দস্তিদারও সঙ্গে থাকবেন শুনে ইস্কুলের অধিকাংশ মেয়েই চাঁদা দিয়েও আজ বনভোজনে আসতে রাজি হয়নি ।

গলা দিয়ে ফাট। কাঁসির মতন আওয়াজ বার করে মিসেস দস্তিদার দস্তুরমতন ভারিক্কে-চালে বলেছিলেন, 'ইন্দু, অমন করে আলুর দমের আলু কাটে

না –কী বললে? তোমার মা ঐ-রকম করেই আলু কাটেন? তোমার মা তাহলে রান্না-বান্নার কিছুই বোঝেন না .শীলা; তুমি হার্মোনিয়াম নিয়ে টানাটানি করছ কেন? গান গাইবে? কী গান? মনে রেখ, আমার সামনে তোমাদের একেলে ন্যাকা-ন্যাকা গজল কি ঠুংরি গাওয়া চলবে না। গান বলতে আমি কেবল বুঝি ব্রহ্মসঙ্গীত।.(গলা চড়িয়ে) নমিতা, ঢালু পুকুর-পাড়ে দাঁড়িয়ে তোমার ও কী হচ্ছে শুনি? যদি গড়িয়ে জলে পড়ে যাও? কী বললে? তুমি সাঁতার জানো? ও সাঁতার জানলে মানুষ বুঝি জলে ডোবে না? অত আর সাহস দেখিয়ে কাজ নেই, শীগগির এখানে চলে এস! দুঃসাহস আর সাহস এক কথা নয়। সাহস কাকে বলে আমার কাছ থেকে শুনে যাও। মিঃ দস্তিদার— অর্থাৎ আমার স্বামী ফরেস্ট অফিসারের পদ পেয়ে প্রথম-প্রথম বড় ভয় পেতেন। তাকে সাহস দেবার জন্যে শেষটা আমাকেও বনে গিয়ে কিছুকাল বাস করতে হয়েছিল। যে-সে বন নয়—যাকে বলে একেবারে গহন অরণ্য, দিনে-দুপুরে সেখানে বেড়িয়ে বেড়ায় গণ্ডার, বরাহ, বাঘ, ভাল্লুক। কিন্তু আমার কিছুতেই ভয় হত না, বাঘভাল্লুককে আমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতুম না। বাঘ-ভাল্লুক— বলতে বলতে হঠাৎ চমকে থেমে গিয়ে তিনি মাথার উপরকার গাছের দিকে বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইলেন।

ভাল্লু তখন পাতার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অত্যন্ত লুব্ধ চোখে আহারের সরঞ্জামগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল ।

ভাল্লু ও মিসেস, দস্তিদার

ফরেস্ট অফিসারের সাহসিনী গৃহিণী মিসেস দস্তিদার স্বামীর মনে সাহস সঞ্চার করবার জন্যে গভীর অরণ্যে গিয়ে বাস করেছিলেন এবং গণ্ডার, বরাহ, বাঘ ও ভাল্লুককে তিনি গ্রাহের মধ্যেও আনতেন না, এ তথ্য তাঁর নিজের মুখেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাঁর মাথার উপরকার গাছের দিকে তাকিয়ে আমাদের ভাল্লুর দাঁত-বার-করা মুখখান দেখেই তিনি যে-ব্যবহারটা করলেন তা অত্যন্ত অদ্ভূত ও কল্পনাতীত ।

মিসেস দস্তিদার প্রথমটা ভাবলেন, তিনি একটা অত্যন্ত অসম্ভব দুঃস্বপ্ন দর্শন করছেন । এটা সুন্দরবন বা হিমালয় বা সাঁওতাল পরগনার দুর্গম জঙ্গল নয়, এ হচ্ছে খাস কলকাতার কাছাকাছি সাজানো বাগান, এখানে স্বাধীন বাঘ-ভাল্লুকের আবির্ভাব হতে পারে না-কখনোই হতে পারে না!

এই বলে মিসেস দস্তিদার নিজের মনকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হল না। কারণ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঐ যে ভয়ঙ্কর মুখখান বেরিয়ে আছে, ওটা একটা রীতিমত জ্যান্ত ভাল্লুকের মুখ ছাড়া আর কী বস্তু হতে পারে? মিসেস দস্তিদারের লেকচার বন্ধ হয়ে গেল, সাতিশয় হতভম্ব হয়ে তিনি পায়ে পায়ে পিছু হটতে লাগলেন ।

ভাল্লু কিন্তু তখন পর্যন্ত মিসেস দস্তিদারকে নিয়ে একটুও মাথা ঘামায়নি। কাল থেকে তার পেটে এক টুকরো খাবার বা একফোট জল পর্যন্ত পড়েনি, কাজেই নিষ্পলক চোখে সে কেবল চড়ি-ভাতির খাবারগুলোর দিকেই তাকিয়ে ছিল।

একটু পরেই ভাল্লু আর লোভ সামলাতে পারলে না, হঠাৎ তড়বড় করে গাছের উপর থেকে নেমে এল।

গাছের উপর থেকে যে একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক নেমে এল, এ-সম্বন্ধে মিসেস দস্তিদারের আর কোন সন্দেহ রইল না।

মিসেস দস্তিদারের মুখের পানে তাকিয়ে ভাল্লু বললে, 'ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ!—অর্থাৎ কিছু খাবার দেবে গো?

কিন্তু মিসেস দস্তিদার ভাল্লুকের ভাষা শেখেননি, কাজেই কিছু বুঝতেও পারলেন না। তবে ভাল্লুর ঘোঁৎ শুনে সাধারণ ভীরু নারীর মতন তিনি যে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন না, এইটুকুই তাঁর পক্ষে বিশেষ বাহাদুরির কথা। এমন কি তিনি উপস্থিতবুদ্ধিও হারিয়ে ফেললেন না। ভাল্লুর প্রথম ঘোঁৎ শুনেই তিনি চমকে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিলেন। বাগানের বাংলো অনেক দূরে এবং কাছাকাছি একটা গাছ ছাড়া অন্য কোন আশ্রয়ও নেই। অতএব মিসেস্ দস্তিদার কালবিলম্ব না করে গাছের উপরেই চড়তে আরম্ভ করলেন।

নমিতা ছিল পুকুর-পাড়ে, সে ঝাঁপ খেয়ে ঝপাং করে জলে গিয়ে পড়ল।

শীলা দেখালে আশ্চর্য তৎপরতা। কাছেই ছিল মালীর কুঁড়েঘর । সে যে কেমন করে বেড়া পেয়ে মালীর ঘরের চালের উপরে গিয়ে উঠল, কেউ এটা দেখবার সময় পেলে না।

আর আর মেয়েরাও 'ওগো-মাগো' বলে চেঁচিয়ে যে যেদিকে পারলে সরে পড়ল। কেবল ইন্দু আর নিভা পালাতে পারলে না, সেইখানেই ভয়ে কাবু হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

ভাল্লু মেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে প্রথমটা ভাবলে, আচ্ছ, এদের কাছে খাবার চাইলে পাওয়া যাবে কি? তারপরেই তার মনে পড়ল, সে যখন পথে পথে

নাচ দেখিয়ে বেড়াত, দর্শকের। তখন খুসি হয়ে তাকে ফলমূল বখশিস দিত। হয়ত তার নাচের কায়দা দেখে এরাও তাকে কিছু খাবার উপহার দিতে পারে। এই ভেবে ভাল্লু তখনি পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং ধেই-ধেই করে ঘুরে-ফিরে নাচতে আরম্ভ করলে।

তার নৃত্য দেখেই ইন্দু আর নিভার স্তম্ভিত ভাবটা কেটে গেল— তারাও প্রাণপণে দৌড় মারলে।

ওদিকে মেয়েদের চীৎকার শুনে কয়েকজন উড়ে মালী ছুটে এসে দেখে, চড়ি-ভাতির খাবারগুলো নিয়ে একটা মস্তবড় ভল্লুক যার-পরনাই ব্যস্ত হয়ে আছে। তারাও অদৃশ্য হয়ে গেল এক মুহূর্তে ।

ভাল্লু তখন মনে মনে ভাবছে, তার নাচে মোহিত হয়েই মেয়েরা এত ভালো ভালো খাবার ছেড়ে দিয়ে গেল ।

মিনিট-চারেকের মধ্যেই পায়েস, সন্দেশ ও রসগোল্লার হাড়ি খালি করে ভাল্লু আস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। থাবা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে একবার উপরপানে তাকিয়ে দেখলে ।

মালীর ঘরের চালের উপরে বসে শীলা চেঁচিয়ে মিসেস দস্তিদারকে ডেকে বললে, ‘দেখুন দিদিমণি, ভাল্লুকটা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে?’

মিসেস দস্তিদার আরো বেশী উঁচু একটা ডালে গিয়ে উঠে বসে ভারিকে চালে বললেন, ‘তাকিয়ে থাকুক-গে ! আমি ওকে ভয় করি না।”

শীলা বলে, ‘দিদিমণি, ভাল্লুকটা বোধহয় আপনার সঙ্গে ভাব করতে চায়।”

মিসেস দস্তিদার আরো বেশী গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘শীল, তুমি কি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ?’

শীলা সকৌতুকে বললে, 'না দিদিমণি, বলেন কী ! আপনি যখন বনের গণ্ডার-বাঘ চরিয়ে এসেছেন, তখন এই সামান্য পোষা ভাল্লুকটা দেখে আপনি কি ভয় পেতে পারেন? কার সাধ্য এ কথা বলে।'

মিসেস দস্তিদার বললেন, 'শীলা, আমি তোমার ঠাট্টার পাত্রী নই। কে তোমাকে বললে এ ভাল্লুকটা পোষা? ওর বড় বড় দাঁত আর নখ দেখেছ? ওর শয়তানি-মাখা চোখ দুটোও দেখ! এ হচ্ছে দস্তুরমত বন্য ভাল্লুক, পথ ভুলে এখানে এসে পড়েছে।

শীলা বললে, 'ভাল্লুকটা শহরেই হোক আর বন্যই হোক ওকে দেখে আমার একটুও ভয় হচ্ছে না।'

চশমার ভিতর থেকে মিসেস দস্তিদারের গোল গোল চোখ আরো ড্যাব ডেবে হয়ে উঠল। বিস্মিত স্বরে তিনি বললেন, 'ভয় হচ্ছে না মানে?'

শীলা বললে, 'ভাল্লুকটার ভাব দেখে মনে হচ্ছে না যে ও এই খোলার চালটার উপরে উঠতে চাইবে। ওরা গাছে চড়তেই ভালোবাসে।'

মিসেস্ দস্তিদার বললেন, 'শীলা, তোমার চেয়ে দুষ্ট, মেয়ে আমি দেখিনি। তুমি আবার আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ ।

শীলা খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'ঐ দেখুন দিদিমণি, ভাল্লুকট আবার গাছের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে ?'

সত্যই তাই। একপেট খাবার খেয়ে ভাল্লুর মনে খুব ফুর্তির উদয় হল। তার সাধ হল মিসেস দস্তিদারের সঙ্গে একটু খেলাধুলে করবে। সে আবার গাছের গুড়ি জড়িয়ে ধরে উপরপানে উঠতে আরম্ভ করলে ।

ঘোড়ার উপরে লোকে যেমন করে বসে, মিসেস দস্তিদার সেইভাবে একটা ডালের উপরে বসে ধীরে ধীরে ডগার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে ভাল্লুব ভারি আমোদ হল। সে মিসেস দস্তিদারের ডালের কাছে গিয়ে বললে, 'ঘোঁৎ।'

সড়াৎ করে মিসেস দস্তিদার আরো এক হাত সরে গিয়ে একেবারে প্রান্তে গিয়ে হাজির হলেন।

ভাল্লুও জিভ দিয়ে নিজের নাক চাটতে চাটতে সেই ডাল ধরে এগুতে লাগল। আর কোন উপায় না দেখে মিসেস দস্তিদার ডাল ধরে ঝুলে পড়লেন। তিনি স্থির করলেন, যা থাকে কপালে— এইবারে তিনি মাটির দিকে লাফ মারবেন। ভাল্লুকের ফলার হওয়ার চেয়ে হাত-পা ভাঙা ভালো ।

ঠিক সেই সময়ে ভাল্লু দেখতে পেলে, দূর থেকে একদল লোক লাঠি-সোট। নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে ছুটে আসছে। সে বুঝলে, গতিক বড় ভালো নয়।

ভাল্লু তাড়াতাড়ি গাছের অন্যদিকে গিয়ে বাগানের পাঁচিলের উপরে লাফিয়ে পড়ল। তারপর সেখান থেকে একেবারে রাস্তার উপরে।

নতুন-রকম লাঠি

ভাল্লু যে বিদায় নিয়েছে, মিসেস দস্তিদার তা দেখতে পেলেন না, কারণ পাছে তার কিম্ভূতকিমাকার হেঁড়ে মুখখান আবার নজরে পড়ে যায়, সেই ভয়ে তিনি প্রাণপণে দুই চোখ মুদে ফেলে গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে দুই পা ছুড়ছিলেন ক্রমাগত ।

কিন্তু ভল্লুর পলায়ন আর কারুর নজর এড়ালো না । নমিতা সাঁতার কাটা বন্ধ করে ঘাটে এসে উঠল। শীলা মালীর ঘরের চাল থেকে চট্ করে নেমে পড়ল। নিভা, ইন্দু প্রভৃতি অন্যান্য মেয়েরাও কেউ গাছের গুড়ির আড়াল আর কেউ-বা ঝোপঝাপ থেকে বেরিয়ে এল। সবাই ডালে দোদুল্যমান মিসেস দস্তিদারের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে রইল ।

শীলা বললে, 'আর দোল খাবেন না দিদিমণি ! চোখ খুলে দেখুন, সেই পথভোলা ভল্লুকট্ আর এখানে নেই।'

মিসেস্ দস্তিদার তখনো চোখ খুললেন না। তাঁর সন্দেহ হল, দুষ্ট, শীলা এখনো তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টায় আছে।

ইতিমধ্যে লাঠি-সোটা নিয়ে পনেরো-ষোলো জন লোক ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল। তারাও যখন অভয় দিলে, মিসেস দস্তিদার তখন অতি সন্তর্পণে চোখ খুলে সেই অবস্থায় যতটা সম্ভব মাথা ঘুরিয়ে চারিদিক দেখে নিলেন।

শীলা বললে, 'দিদিমণি, আপনি যে গভীর জঙ্গলে গিয়ে এমন চমৎকার গাছে চড়তে আর এমন মজার দোল খেতে শিখেছেন, আমরা কেউ তা জানতুম না। কী বলিস, না রে নমিতা?

কিন্তু নমিতা হচ্ছে মুখচোরা মেয়ে, মনে মনে হেসেও মুখে কিছু বলতে সাহস করলে না।

মিসেস দস্তিদার বেশ বুঝতে পারলেন, আজ যে অভাবনীয় কাণ্ডটা হয়ে গেল, এর পরে আর প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবু অনেক কষ্টে নিজের কঠিন গাম্ভীর্য কতকটা বজায় রাখার চেষ্টা করে তিনি বললেন, 'আমার হাত ফুটে ছিড়ে যাচ্ছে। আর আমি বুলতে পারছি না। শীগগির আমাকে নামিয়ে নাও, নইলে আমি ধপাস করে পড়ে যাব।'

সকলে মহা সমস্যায় পড়ে গেল, কেমন করে মিসেস দস্তিদারকে গাছ থেকে আবার মাটির উপরে ফিরিয়ে আনা যায়? খানিকক্ষণ পরামর্শের পর দুজন লোক লম্ব দড়ি নিয়ে গাছের উপরে গিয়ে উঠল। আরো খানিকক্ষণ চেষ্টার পর তারা মিসেস দস্তিদারকে ছুই বাহুমূলে দড়ির বাধন লাগিয়ে তাকে আবার পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে পাঠিয়ে দিলে। আমরা খবর পেয়েছি, সেইদিনই বাগান থেকে ফিরে এসে মিসেস দস্তিদার তিনমাসের ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন। অন্ততঃ কিছুকালের জন্যে তিনি আর কারুর কাছে মুখ দেখাতে রাজি নন।

যারা লাঠি-সোটা নিয়ে এসেছিল ভাল্লুর খোঁজে, তারা বাগান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে ভাল্লু-বেচারি একটু বিপদে পড়েছে। সে মনসা গাছ চিনত না। পাঁচিলের উপর থেকে সে যেখানে লাফিয়ে পড়েছিল সেখানে ছিল মস্ত-বড় একট। মনসার ঝোপ। সুতরাং তার অবস্থা বুঝতেই পারছ! যদিও বড় বড় ঘন লোম থাকার দরুন তার দেহের অনেক জায়গাই মনসা-কাটার খোঁচা থেকে বেঁচে গেল, তবু তার নাকের ডগায় এবং চার পায়ের তলায় বিধে গেল অনেকগুলো মনসা-কাঁটা।

ভাল্লু রক্তাক্ত নাকের ডগায় থাবা ঘষছে, জিভ দিয়ে পায়ের তলা চাটছে আর মনে মনে বলছে, ‘এ কি রকম গাছ রে বাবা একসঙ্গে এতগুলো কামড় মারে। হুঁ, এ গাছটাকে ভালো করে চিনে রাখা দরকার- ভবিষ্যতে যেখানে এমন সর্বনেশে গাছ থাকবে সেদিকে আর মাড়াব না!’

হঠাৎ গোলমাল শুনে ভাল্লু চমকে মুখ তুলে দেখে, বাগানের লাঠিধারী লোকগুলো আবার তার দিকে ছুটে আসছে।

ভাল্লু তখন মরছে কাঁটার জ্বালায়, তার উপরে আবার এই নুতন বিপদ দেখে তার মেজাজ গেল চটে। সে বুঝলে এরা তাকে ধরতে পারলেই ফের সেই চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেবে—হিমালয়ে যাবার পথ যেখানে লোহার দরজা দিয়ে বন্ধ। সে তখনি পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং শুন্যে সামনের দুই থাবা নেড়ে নিজের ভাষায় আস্ফালন করে বললে, 'আয় না মানুষের বাচ্চারা,— বুকের পাট থাকে তো এগিয়ে আয়!’

কিন্তু তার চমকপ্রদ হুঙ্কার শুনে এবং রোমাঞ্চকর মুখভঙ্গি দেখে বুদ্ধিমান মানুষের বাচ্চারা আর অগ্রসর হল না। কয়েকজন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং কয়েকজন দৌড় মেরে আবার বাগানের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

ভাল্লু বুঝলে এই কাপুরুষদের দেখে তার কোনরকম ভয় পাবার দরকার নেই। সে তখন আবার বসে পড়ে আড় চোখে তাদের দিকে দৃষ্টি রেখেই নিজের আহত থাবাগুলো চাটতে লাগল। তার ছুটে পায়ের ভিতরে দুটো মনস-কাঁটা ঢুকে বসে গিয়েছিল।

এমন সময়ে অন্য কোন বাগান থেকে খবর পেয়ে একজন বন্দুকধারী লোক সেখানে ছুটে এল। কিন্তু তাকে দেখেও ভ'লুর ভাবান্তর হল না, তার কারণ

সে এখনো বন্দুককে চেনবার সুযোগ পায়নি। সে ভাবলে, ও-লোকটার হাতে যা রয়েছে তা একটা নতুন-রকম লাঠি ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু সেই নতুন-রকম লাঠিট যখন দপ করে জ্বলে উঠে বেয়াড়া এক গর্জন করলে ভাল্লুকে তখনি চার পা তুলে ভড়াক করে লাফ মেরে রীতিমত আর্তনাদ করতে হল।

ভাগ্যে বন্দুকটা ছিল পাখিমারা, তার ভিতরে বুলেটের বদলে ছিল ছররার কার্তুজ। কতকগুলো ছররা মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়ে ধুলো ওড়ালে, কতকগুলো তার লোমের আবরণ ভেদ করতে পারলে না এবং একটা তার বাঁ-কানকে ফুটো করে দিল।

ভাল্লুর পক্ষে তাই যথেষ্ট হল। বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে সে বেগে পলায়ন করলে। পিছন থেকে আবার সেই নতুন-রকম লাঠির গর্জন শোনা গেল, তার কানের কাছ দিয়ে কতকগুলো কি সোঁ-সোঁ করে চলে গেল এবং সেও নিজের গতি আরো বাড়িয়ে দিলে।

ছুটতে ছুটতে সে ভাবতে লাগল, 'বাপ রে বাপ, এ কোন আজব দেশে এসে পড়লুম? মানুষের মেয়ে এখানে গাছে উঠে ডাল ধরে দোল খায়, গাছ এখানে কামড় মারে, লাঠি এখানে বিদ্যুৎ জ্বেলে ধমকে ওঠে, আর কী যে ছুড়ে কান ফুটো করে দেয়, কিছুই বোঝা যায় না। হিমালয়ের পথে যে এত বাধা, সেটা তো জানা ছিল না, এখন মানে মানে দেশে গিয়ে পৌছতে পারলেই যে বাঁচি ।

ভাল্লু দৌড়চ্ছে আর দৌড়চ্ছেই—-বিশেষ করে নতুন-রকম লাঠি দেখে তার পেটের পিলে চমকে গেছে দস্তুরমত। অনেক পথ, অনেক গ্রাম পার হয়ে গেল, তবুও সে থামতে রাজি নয়। যেখান দিয়ে সে যাচ্ছে সেখানেই উঠছে হৈ-

হৈ রব। একজন সাইকেলের আরোহী বেশী ব্যস্ত হয়ে পালাতে গিয়ে মাটির উপরে মুখ থুবড়ে খেলে প্রচণ্ড আছাড়, একখানা গরুর গাড়ীর গরু দুটো মহা ভয়ে দৌড়তে লাগল রেসের ঘোড়ার মত, ছেলেরা কেঁদে কঁকিয়ে ওঠে, মেয়ের আঁৎকে মূর্ছা যায়, অথর্ব বৃদ্ধরাও দৌড়-বাজিতে হারিয়ে দেয় জোয়ান যুবকদের। এমন কি একটা এক-ঠেঙে খোড়াও অদ্ভুত তৎপরতা দেখিয়ে একটা খুব উচু বটগাছের মগ-ডালে না ওঠা পর্যন্ত থামল না।

ছুটতে ছুটতে ভাল্লুর দম বেরিয়ে যাবার মত হল। হঠাৎ সামনে একখানা বাড়ী দেখে সে স্থির করলে, তার ভিতরই আশ্রয় নেবে।

বাড়ীর ভিতরে ঢুকেই উঠোন। উঠোনের এক কোণের এক ঘরে বসে একটা উড়িয়া বামুন উনুনে কি তরকারি রাঁধছিল। আচমকা স্তম্ভিত চক্ষে সে দেখলে, ঘরের দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিপুলদেহ এক ভাল্লুক। পরমুহুর্তেই সে 'হা জগড়নাথঅ' বলে দাঁতকপাটি লেগে চিৎপাত হয়ে একেবারে অজ্ঞান !

খাবার দেখেই ভল্লুর পেটে ক্ষিধে আবার চোঁ-চোঁ করে উঠল। সে গুটি-গুটি এগিয়ে একখানা থালা থেকে কি-একটা তরকারি একগ্রাস তুলে নিলে – ওরে বাবা রে, কী ভয়ঙ্কর ঝাল রে। মনসার কাটা এবং বন্দুকের ছররাও যা পারেনি, তরকারির লঙ্কা করলে তার সেই দুর্দশা। সে ঘরের মেঝেয় পড়ে ছট্ ফট্ করতে ও গড়াগড়ি দিতে লাগল।

হঠাৎ দুম করে একখানা প্রকাণ্ড থান-ইট এসে পড়ল তার পিঠের উপরে। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ (অর্থাৎ কে রে) বলে চেঁচিয়ে ভাল্লু একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল, কিন্তু কেউ কোথাও নেই, মেঝের উপরে কেবল উড়িয়া বামুনটার অচেতন দেহ ছাড়া।

আসল কথা হচ্ছে, বাড়ীরই একজন লোক জানলা দিয়ে ইটখানা ছুঁড়েই লম্ব দিয়েছে।

কিন্তু ভ'লু ভাবলে, এও একটা আজগুবি কাণ্ড । কেউ কোথাও নেই—ইট ছোড়ে ঘর ! কে কবে এমন কথা শুনেছে? আরে ছোঃ, এমন জায়গায় কোন ভদ্র ভাল্লুকের থাকা উচিত নয় । ভারি বিরক্ত হয়ে ভাল্লু আবার পথে বেরিয়ে পড়ল ।

ভোট-বিভ্রাট

কলকাতা থেকে কিছু দূরে ছিল একটি শহর, তার নাম আমি বলব না। সেইখানে আজ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার না চেয়ারম্যান কিংবা জেলাবোর্ডের প্রেসিডেন্ট বা অন্ত কিছু নির্বাচনের জন্যে মহা ধুমধাম পড়ে গিয়েছে। ধূমধামের কারণটা বলি।

শহরে বাস করতেন মুকুন্দপুরের জমিদারদের দুই তরফ—বড় এবং ছোট। বড় তরফের নাম আনন্দ চৌধুরী। জ্ঞানে, চরিত্রে ও সহৃদয়তায় তার মতন লোক ও-তল্লাটে আর কেউ ছিল না। লোকের উপকার করবার সুযোগ পেলে আনন্দবাবু নিজেকে ধন্য বলে মনে করতেন। আর লোকের উপকার করবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এই নির্বাচন ব্যাপারে।

ছোট তরফের সাধুচরণ চৌধুরী ছিলেন ঠিক উল্টো রকম মানুষ । 'সাধু' নামের এমন অপব্যবহার আর কখনো হয়নি। সাধু তামাক খেতে শিখেছিলেন গোঁফ গজাবার অনেক আগেই—অর্থাৎ এগারো উৎরে বারোতে পা দিয়েই। জীবনে তিনি কখনো একটিমাত্র আধলাও দান করেননি-—অথচ নানানরকম বদ-খেয়ালিতে উড়িয়ে দিয়েছেন কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা । শোনা যায় একবার এক বিড়ালের বিয়েতে তিনি নাকি পনেরো হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। নিষ্ঠুরতায়ও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর মা ছেলের অসৎ ব্যবহারের প্রতিবাদ করতেন বলে নিজের মাকেও তিনি তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাড়ী থেকে। তার লেখাপড়ার কথা না বলাই ভালো— কোনরকমে তিনি নিজের নামটি সই করতে পারতেন মাত্র।

আনন্দ ছিলেন সাধুর খুড়তুতো ভাই। আনন্দকে সবাই শ্রদ্ধা করত বলে সাধুর মন জ্বলত দারুণ হিংসার আগুনে। আনন্দকে জব্দ ও লোকের চোখে খাটো করবার জন্যে সর্বদাই তিনি হরেক-রকম ফন্দি আঁটতেন। সেইজন্যেই নির্বাচন ব্যাপারে তিনি হয়েছেন আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী। -

যেমন বিষ্ঠা-বুদ্ধি, সাধুর চেহারাও তেমনি । তাঁর ঘাড়ে-গর্দানে, বিশাল-ভুড়িওয়ালা বেঁটে-সেটে কালো কুচকুচ মুখখানি দেখলেই চোখ বুজে ফেলবার ইচ্ছা হয়। তাঁর কেশহীন মাথাটি কুমড়োর মতন তেল, ঠোঁট খান কাফ্রির মতন পুরু, নাক এত বেশী চ্যাপ্টা যে দেখলে মনে পড়ে ওরাং-ওটাংকে, এবং গর্তে-বসা চোখ দুটো হচ্ছে রীতিমত কুতকুতে।

তা বলে তোমরা কেউ যেন সাধুকে বোকা ঠাউরে বোসে না। তাঁর ঘটে এটুকু বুদ্ধি ছিল যাতে করে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর পক্ষে বৈধ সৎ-উপায়ে আনন্দের বিরুদ্ধে ভোট সংগ্রহ করা অসম্ভব। লোকে আনন্দকে ভালোবাসে এবং তাকে ঘৃণা করে।

দেশের একদল ওঁচা লোক করত সাধুর মোসাহেবি। ভোটারদের কাছে গিয়ে তারা রটিয়ে বেড়াতে লাগল, যারা সাধুর পক্ষে ভোট দেবে তার প্রত্যেকেই ভোটের এক হপ্তা আগে থেকে রোজ এক টাকার মণ্ডা-মিঠাই-রসগোল্লা উপহার পাবে এবং ভোটের দিন সকালে সাধুর বাড়ীতে তাদের জন্যে হবে যে বিরাট ভোজের আয়োজন, তার মধ্যে থাকবে পুরো একশো রকম চর্ব্য-চোস্য-লেহ-পেয়।

আনন্দের কানেও এ-খবর উঠতে দেরি লাগল না। তিনি আরো শুনলেন, অধিকাংশ ভোটারই সাধুর পাঠানো দৈনিক মণ্ডা-মিঠাইরসগোল্লার সদ্ব্যবহার করছে এবং অনেকে আবার খাবারের বদলে নিচ্ছে একটি করে নগদ টাকা।

আনন্দ মনে মনে দুঃখিত হলেন মানুষের অকৃতজ্ঞতা দেখে, দেশের ভালোর জন্যে কতকাল ধরে তিনি কত কাজ করেছেন, আজি সামান্য জলখাবারের লোভেই লোকে তা ভুলে গেল! বুঝলেন, এযাত্রায় তার পরাজয় অনিবার্য।

ভোটের দিন দুপুরবেলায় সাধুর বাড়ীতে পড়ল শত শত পাত । একশো রকম খাবারকে হস্তগত করার জন্যে প্রত্যেক লোককে আসন থেকে হাত বাড়িয়ে রীতিমত হামাগুড়ি দিতে হল। খাওয়া-দাওয়ার পর প্রত্যেক ভোটারের ভুড়ি এত ভারি আর ডাগর হয়ে উঠল যে, সাধুর প্রশস্ত বৈঠকখানার ঢালা-বিছানার উপরে ঘণ্ট-দুই চিৎপাত হয়ে বিশ্রাম না করে কেউ আর খাড়া হয়ে দাড়াতে পারলে না।

ওদিকে আনন্দের বাড়ী দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন নীরবে কাঁদছে। সেখানে না আছে ভিড়, না আছে গোলমাল।

ভোটের পরিণাম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে সাধু খুব জমকালো গরদের জামা-কাপড়-চাদর পরে মোসাহেবদের সঙ্গে পান চিবোতে চিবোতে মোটরে গিয়ে উঠলেন । মোটরখানা লতা-পাতা-ফুল দিয়ে সাজানে, তাঁর হাতেও জড়ানো বেলের গোড়ে এবং তিনি কপালে পরেছিলেন মা-কালীকে পূজে দিয়ে মস্ত একটি সিঁদুরের ফোঁটা।

যেখানে ভোট নেওয়া হচ্ছিল মোটর সেই মণ্ডপের দিকে চলল। সাধুর দলের কর্মীরা তাকে দেখে জয়নাদ করে উঠল।

ঠিক সেই সময় দেখা গেল মোটরে চড়ে আনন্দবাবুও ঘটনাক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করেছেন। তিনি একলা। তাকে দেখে কেউ জয়ধ্বনিও করলে না।

একগাল হেসে নিজের মোটর থেকে সাধু চেঁচিয়ে বললেন, 'আনন্দদাদা, খামোকা মন খারাপ করবার জন্যে কেন তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছ বল দেখি? এবারে তোমার কোন আশাই নেই।'

আনন্দ বললেন, 'জানি ভাই, জানি । ধরে নাও আমি বেরিয়েছি তোমাকেই অভিনন্দন দেবার জন্যে!'

আনন্দের গাড়ী এগিয়ে গেল। সাধুর এক মোসাহেব বললে, দেখছেন কর্তা । আনন্দবাবু ভাঙবেন তবু মচকাবেন না! আবার আপনাকে ঘুরিয়ে ঠাট্টা করে যাওয়া হল!'

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সাধু বললেন, 'রোসে না, আগে ভোটাভুটির হাঙ্গামাটা চুকে যাক, তারপর-ওরে বাপ রে বাপ ও আবার কে রে?

মোসাহেবদেরও চক্ষু ছানাবড়া!

ব্যাপারটা হচ্ছে এই । ভোটের মণ্ডপের খানিক আগেই পথের পাশে ছিল একটা ছোটখাটো জঙ্গল। হিমালয়ের যাত্রী শ্রীমান ভাল্লু এই পথ দিয়ে যেতে যেতে রাস্তায় হৈ-চৈ আর অসম্ভব লোকের ভিড় দেখে ঐ জঙ্গলের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু একে বহুক্ষণ আহারাদির অভাবে তার পথশ্রান্ত দেহ এলিয়ে পড়েছে, তার উপরে তার সূক্ষ্ম ভলুকনাসা তাকে খবর দিলে যে, খুব কাছেই কোথায় হরেক-রকম খাবার-দাবার অপেক্ষা করছে ক্ষুধার্ত উদরের জন্যে ;— কাজেই ব্যাপারটা তদারক করবার জন্যে জঙ্গল ছেড়ে তাকে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হয়েছে ।

পর-মুহূর্তে সাধুর মোটরখানা বোঁ-বোঁ করে একেবারে তার উপরে এসে পড়ল—তাকে চাপা দেয় আর কি!

কিন্তু হিমাচলের ভাল্লুক এত সহজে মোটর চাপা পড়বার জন্যে জন্মায়নি। এক লাফ মেরে সে মোটরের সামনের দিকে উঠে পড়ল —কিন্তু ইস্! এখানটা যে আগুনের মতন গরম! তড়াক করে আর এক লাফ—ভাল্লু হাজির হল মোটরের ছাদে। গাড়ীর ছাদে একটা স্বাধীন ও বন্য ভাল্লুক নিয়ে কোন অতি-সাহসী লোকও মোটর চালাতে পারে না। কাজেই ড্রাইভার মোটর থামিয়ে, দিলে চোঁ-জোঁ চম্পট! সাধুর তিন মোসাহেবও বিনা বাক্যব্যয়ে মোটরের দরজা খুলে হুড়মুড় করে রাস্তার উপরে ঝাপ খেলে এবং দেখতে দেখতে তারাও অদৃশ্য। সাধুর আর্তনাদ তারা আমলেও আনলে না। সাধুও এই বিপদজনক গাড়ীখানা ত্যাগ করবার জন্যে চটপট গাত্রোথন করেই সভয়ে চোখ পাকিয়ে দেখলেন, ছাদের উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে ভাল্লু তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। অমনি তিনি ধপাস করে আবার বসে পড়ে কেঁদে উঠলেন, 'ওগো, মাগোG"

তারপরেই হল একটা আরো ভয়ানক কাও। ভাল্লুর বিপুল ভার সইতে না পেরে সাধুর মাথার উপরে ছাদ ভেঙে পড়ল।

ভাল্লুও ভয়ে অ্যাঁৎকে উঠে দুই হাত—অর্থাৎ সামনের দুই পা বাড়িয়ে একটা কিছু ধরতে গিয়ে জড়িয়ে ধরলে সাধুচরণকেই এবং তারপর সেই অবস্থাতেই টলে গাড়ীর বাইরে গিয়ে পড়ল ।

পায়ের তলায় শক্ত মাটি পেয়ে ভাল্লু নিজের আলিঙ্গন থেকে সাধুকে মুক্তি দিলে সাধু ভয়ে আর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠবার সময় পেলেন না, নিজের গোলগাল বপুখানি নিয়ে পথের ধুলোর উপর দিয়ে ক্রমাগত গড়াতে আর গড়াতে সুরু করলেন, তারপর অদৃশ্য হলেন পথের পাশে পচা জলের খানায়।

ভাল্লু চমকে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তার একটুও লাগেনি। তার নাসিকা তখন খাবারের সুগন্ধ পেয়ে আবার উৎসাহিত হয়ে উঠেছে ।

ভোটমণ্ডপের একপ্রান্তে সাধুচরণ নিজের পক্ষের ভোটারদের লোভ দেখাবার জন্যে বৈকাল জলযোগের যে বিপুল আয়োজন করেছিলেন, সুগন্ধ আসছিল এইখান থেকেই। ভল্লুর সুচতুর নাসিক পথনির্দেশ করলে, সে অগ্রসর হল দ্রুতপদে ভোটমণ্ডপ দৃষ্টিগোচর হবামাত্র সে একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকের ভিড় দেখে। কিন্তু তীক্ষ্ণ নেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেও সে যখন কারুর হাতে সেই নতুন-রকম লাঠি দেখতে পেলে না, তখন আশ্বস্ত হয়ে এগিয়ে চলল দ্বিগুণ বেগে। ওদিকে একটা বিরাট ভাল্লুককে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসতে দেখেই দিকে দিকে রব উঠল—'মা রে, বাবা রে, পালা রে, খেলে রে এক মিনিটের মধ্যে ভোটমণ্ডপ জনশূন্য হয়ে গেল। তারপর সাধুর খাবারগুলো যে কার বিপুল উদর-গহবরে স্থানলাভ করলে, সেটা বোধহয় আর বলে দিতে হবে না ।

সাধু ভাল্লুকের ভয়ে কিছুকাল আর বাড়ীর বাইরে পা বাড়াননি। ভোটের ফলাফল যখন বেরুল তখন তিনি জানলেন যে, ভোটাররা তাঁর খাবার খেয়ে পেট ভরিয়েছে বটে, কিন্তু ভোট দিয়েছে আনন্দ চৌধুরীকেই। সুতরাং এ-যাত্রা সাধুচরণের হল লাভে ব্যাং, অপচয়ে ঠ্যাং' ।

অতি-বুদ্ধিমান সোনা-মোনা

দিনের বেলায় যেখান দিয়ে যায় সেইখানেই নতুন নতুন গোলযোগের সৃষ্টি হয় দেখে ভাল্লু স্থির করেছে, এবার থেকে রাত না এলে সে আর পথের উপরে পদার্পণ করবে না ।

অতএব যতক্ষণ দিনের আলো জ্বলত সে কোন ঝোপঝাপের ভিতরে গিয়ে আড্ডা গাড়ত। কখনো কুণ্ডলী পাকিয়ে পিছনের পা-দুটোর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখত, কখনো চুপচাপ শুয়ে শুয়ে ভাবত তার সাধের হিমালয়ের কথা।

রাতের অন্ধকারে আরম্ভ হত তার যাত্রা ক্ষুধা পেলে ফলমূল সংগ্রহ করত, তেষ্টা পেলে পাওয়া যেত নদী বা পুকুরের জল। চিড়িয়াখানায় বন্দী অবস্থায় তার খাওয়া-দাওয়ার ভাবনা একটুও ছিল না বটে, কিন্তু কোন-কোনদিন পেট-ভরা খাবার না জুটলেও চিড়িয়াখানায় ফিরে যাবার কথা ভুলেও সে ভাবতে পারত না। স্বাধীনতা যে কত মিষ্টি, ভাল্ল তা ভালো করেই অনুভব করতে পেরেছে।

একরাতে ভাল্লু হেলে-দুলে মনের মুখে পথ চলছে, হঠাৎ এল ঝমঝম করে জল। সে তখন একটা নিঃসাড় গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। ভাল্লু অন্ধকারেও চোখ চালাতে পারত, চারিদিকে তাকিয়ে একটা মাথা গোজবার জায়গা খুজতে লাগল। তারপর একখানা বাড়ীর দেওয়ালের তলার দিকে একটা গর্ত দেখে সুড় সুড়, করে সে তার ভিতরে গিয়ে ঢুকল ।

ঢুকে দেখে, বাঃ দিব্যি একটি শুকনো খটখটে ঘর। সে ভাবতে লাগল, ‘মানুষেরা তাদের বাড়ীর চারিদিকের দেওয়ালেই বড় বড় গর্ত কাটে বটে, কিন্তু গর্তগুলো আবার লোহার ডাণ্ড বসিয়ে এমনভাবে আগলে রাখে যে মাথা গলাবার

ফাঁকটুকুও পাওয়া যায় না। খামোকা এ-র কম গর্ত কেটে বোকামি করবার কারণ কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু এ-গর্তটা তো সে-রকম নয়। এতে লোহার ডাণ্ডা বসানো নেই, এর ভিতর দিয়ে মুণ্ডুর সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসেই ধড়টাও গলিয়ে ফেলা গেল। নিশ্চয় এ হচ্ছে কোন বুদ্ধিমান মামুষের কীর্তি।

ভাল্লুর আন্দাজ মিথ্যা নয়। এ গর্তটা কেটেছে দুজন অতি বুদ্ধিমান মানুষ, তাদের নাম সোনা ও মোনা। এ অঞ্চলের চোরেদের সর্দার হচ্ছে সোনা আর মোনা, দেওয়ালে সিদ্ধ কেটে তার ঢুকেছে গৃহস্থের বাড়ীতে।

নিশুত রাত, তার উপরে বাদলার ঠাণ্ডা পেয়ে বাড়ীর লোকরা আরামে ঘুম দিচ্ছে, ঘরে ঘরে শোনা যাচ্ছে নাসা-যন্ত্রে নিদ্রাদেবীর পুজা-মন্ত্র। সোনা-মোনা নির্বিবাদে কাজ সারলে। সোনার হাতে টাকা ও গহনার বাক্স এবং মোনার হাতে একখানা কাপড়ে বাঁধা এককাঁড়ি রূপোর গেলাস-বাটি-থালা।

তার যে-ঘরে সিঁধ কেটেছিল সেই ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

মোনা চুপিচুপি বললে, 'দাদা, আজ মার দিয়া কেল্লা!'

সোনা বললে, 'চুপ, আগে বাইরে যাই, তারপর কথা।'

পা টিপে টিপে তার ঘরের ভিতরে ঢুকল। অমনি ভাল্লু বললে, 'ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-ঘোঁৎ—অর্থাৎ, 'তোমরা আবার কে বটে হে?

এখানে একটা বিষয় পরিস্কার করে বলা দরকার। তোমরা বোধহয় ভাবছ, ভাল্লুর এক 'ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দের রকম-রকম মানে হয় কেন? তার কারণ হচ্ছে, বাঘ ভাল্লুক শৃগাল কুকুর বিড়াল প্রভৃতির, এবং পক্ষীদেরও শব্দ-ভাণ্ডারে আমাদের মতন বেশী শব্দ নেই। অধিকাংশ সময়েই তারা একই রকম শব্দ করে বটে, কিন্তু উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে সেই একই রকম শব্দের অর্থ হয় ভিন্ন-ভিন্ন রকম । যেমন, কুকুর ডাকে ঘেউ-ঘেউ করে, কিন্তু শত্রুকে দেখলে সে

ঘেউঘেউ করে বলে—'ভাগো হিয়াসে, নইলে কামড়ে দেব? আর মনিবকে দেখলেও ঐ এক ঘেউঘেউ রবেই জানায়—'এস প্রভু আমি তোমার পা চেটে দি।'

অন্ধকারে ভাল্লুর সম্ভাষণ শুনেই সোনা-মোনা ভয়ানক চমকে গেল ।

মোনা টর্চ জ্বেলেই 'ই-হি-হি-হি-হি'বলে চীৎকার করে চিৎ পটাং! তারপর একে বারে অজ্ঞান। তার হাতের রূপার বাসন গুলো মেঝের উপরে ছড়িয়ে পড়ে ৰেজে উঠল ঝন-ঝন-ঝন।

সোনাও ভাল্লুর বিপুল মুখখান দেখতে পেলে। সে অজ্ঞান হয়ে গেল না বটে, কিন্তু সেইখানেই দাঁড়িয়ে ঠক্-ঠক করে কাঁপতে লাগল।

তোমরা ভাল্লুকের জ্বর দেখেছ? যখন-তখন ভাল্লুকদের দেহে একরকম কাঁপুনি আসে এবং খানিক পরেই আবার তা থেমে যায় ;– একেই বলে ভাল্লুকের জ্বর। সে সময় তাদের অবস্থ দেখলে মনে হয়, তারা ভারি কষ্ট পাচ্ছে ।

সোনার কাঁপুনি দেখে ভাল্লুও ভাবলে, লোকটার দেখছি আমারই মতন জ্বর এসেছে। সহানুভূতি-মাখা স্বরে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে সে বলতে চাইলে, 'ভয় নেই ভায়া, ও-রকম জ্বর বেশীক্ষণ থাকে না।'

কিন্তু তার কথা শুনে সোনার কাঁপুনি দ্বিগুণ বেড়ে উঠল। তাকে ভালো করে সান্তনা দেবার জন্যে ভাল্লু কয় পা এগিয়ে গেল।

অমনি ছুটে গেল সোনার আচ্ছন্ন ভাবটা। সে বিকট স্বরে 'ওরে বাবা রে, গেছি রে' বলে চেঁচিয়ে উঠে ঘরের বাইরে মারলে এক লাফ।

ইতিমধ্যে চীৎকারে ও বাসন ফেলে দেওয়ার শব্দে বাড়ীশুদ্ধ সবাই জেগে উঠেছে এবং চারিদিকে ছুটোছুটি করছে লোকজন— বাড়ীর উপরে-নীচে জ্বলে উঠেছে অনেকগুলো লণ্ঠন ।

সোনা ভারি হুঁসিয়ার চোর। ভাল্লুকে দেখেও সে গহনার বাক্স ছাড়েনি। তার আবির্ভাবে 'চোর, চোর' রব জাগল । এবং উঠোনে লোকের ভিড় দেখে সে তড় বড় করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে সিঁড়ির মুখে দোতলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বাড়ীর কর্তা স্বয়ং । তিনি বামাল সমেত সোনাকে গ্রেপ্তার করলেন।

সোনা কর্তার দুই পা জড়িয়ে ধরে কাকুতি-মিনতি করে বললে, 'হুজুর । আমাকে মারুন ধরুন, থানায় দিন–কিন্তু আর ভাল্লুক লেলিয়ে দেবেন না। চোর ধরার জন্য আপনার ভাল্লুক পুষেছেন জানলে আমরা কি আর এ-বাড়ীতে পা বাড়াতুম?

কর্তা মহা বিস্ময়ে বললেন, 'ভাল্লুক'? আচম্বিতে উঠোনে আবার রব উঠল—"ভাল্লুক, ভাল্লুক ! চোখের পলক পড়তেই সকলে যে যার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিলে।

লোকের জ্বলন্ত লণ্ঠনগুলো উঠোনেই ফেলে রেখে গেল ! উঠানের উপরে দাঁড়িয়েছিল কেবল কর্তার ছোট ছেলে খোকাবাবু—বয়স দেড় বৎসর।

কর্তা স্তম্ভিত চোখে দেখলেন, একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক খোকার কাছে এসে দাঁড়াল । নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না বটে, কিন্তু ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেল!

এদিকে খোকার কিন্তু ভয়-ডর কিচ্ছু নেই। সে কুকুর ভারি ভালোবাসত এবং ভাল্লুকে ঠাউরে নিলে বোধহয় বড়জাতের কোন কুকুর বলেই। সে রাঙা রাঙা ঠোটে ফিক-ফিক করে হেসে, নধর নধর হাত দুখানি নেড়ে ভাল্লুকে ডাকতে লাগল—'আয়, আয়, আয়।'

ভাল্লু যখন পথে পথে নর্তক-জীবন ও চিড়িয়াখানায় বন্দী-জীবনযাপন করত, তখনি সে আবিষ্কার করেছিল একটি মস্তবড় সত্য। মানুষের খোকা-খুকিরা

তাকে যত ভালোবাসে ও আদর করে, এত আর কেউ নয়। আজ পর্যন্ত সে যত খাবার বখ শিস পেয়েছে তার বেশীর ভাগই এসেছে খোকা-খুকিদের নরম নরম হাত থেকে। তাই সে খোকা-খুকি দেখলেই নিজের বিশেষ বন্ধু বলে মনে করত।

আজও সবাই যখন ভয় পেয়ে লম্বা দিলে, তখন এই নির্ভীক ছোট্ট খোকাটির সাদর আহবান শুনে ভাল্লুর মন বড় খুসি হয়ে উঠল। সে তখনি খোকার পায়ের তলায় চার পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে আনন্দে গদ-গদ হয়ে একবার এপাশে, আর একবার ওপাশে ফিরতে লাগল।

খোকাও তার পাশে বসে একবার ফিক্ করে হাসে এবং একবার কচি-কচি হাত বাড়িয়ে ভাল্লুর বড়বড় লোম গুছি করে ধরে টান মারে।

ওদিকে খোকার মা প্রথমটা ভয়ে পালিয়ে গেলেও ছেলেকে উদ্ধার করবার জন্যে আবার উঠোনের উপরে ছুটে এসে, ব্যাপার দেখে অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন ।

ভাল্লু তখন তার পায়ের কাছেও গিয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। খোকার মা ভরসা পেয়ে বললেন, "কী ভালোমানুষ ভাল্লুক গো! সিঁড়ির উপরে কর্তাও তখন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। ভয় ও বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে তিনি বললেন, কিন্তু আমার বাড়ীতে ভল্লুক এল কোথা থেকে?

সিঁধেল সোনা তখন আসল ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। সে বললে, ‘হুজুর, ঐ ঘরে আমরা সিঁধ কেটেছি। সিঁধের গর্ত দিয়ে ঐ বনের ভাল্লুকটা নিশ্চয় বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়েছে।

ভাল্লুক কারুকে আক্রমণ করে না, উল্টো পোষা কুকুরের মতন খেলা করে দেখে বাড়ীর লোকেরা আবার উঠোনের আনাচ-কানাচ থেকে উকিঝুঁকি

মারতে লাগল। খোকার মা ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ভয়ে ভয়ে ভাল্লুর গায়ে-একবার হাত বুলিয়ে নিলেন।

কর্তা সোনাকে চাকরদের হাতে সমর্পণ করে নীচে নেমে সিঁধের ঘরে ঢুকলেন। তখনো মোনার ভির্মি ভাঙেনি। সেও ধরা পড়ল। সিঁধের গর্তটা পরীক্ষা করে তিনি ঘরের বাইরে এসে সানন্দে বললেন, 'আমার সর্বস্ব যেতে বসেছিল, ভাগ্যে ঐ কাদের পোষা ভাল্লুক এসে চোর ধরেছে, তাই আবার সব ফিরে পেলুম।

খোকা মায়ের কোল থেকে ভাল্লুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

কর্তা বললেন, 'এই ভাল্লুকটিকে আমি পুষব, ও আমার খোকার খেলার সাথী হবে।'

গাঁটছড়ার 'টাগ-অব-ওয়ার'

বড়ই বিপদ যে-বাঁধন ছিঁড়ে পালাতে চাই আবার সেই বন্ধন?

ভাল্লুর মুখ শুকিয়ে গেল মনের অসুখে।

ভাল্লুকে পুষেছেন খোকার বাবা। তার কুকুর ছিল, এখন মরে গেছে, তারই শিকল দিয়ে ভাল্লুকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

যদিও ভাল্লুর আদর-যত্নের অভাব নেই, তার জন্যে আসে ভালো ভালো খাবার, খোকার মা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, খোকন এসে তার সঙ্গে প্রায় সারাদিনই কথা কয়, খেলা করে, সে-পাড়ার যত ছোট ছোট ছেলেমেয়েও তার চারিপাশ ঘিরে খেলাধুলো করে, তবু ভাল্লু খুসি হতে পারে না। মুখখানি বিমর্ষ করে চুপ মেরে বসে থাকে। আর খেলাধুলো করবে কি, দু-পা এগুতে গেলেই শিকলে পড়ে টান। গলায় দড়ি দিয়ে কার খেলার সাধ হয় বল?

হপ্তাখানেক গেল। সন্ধ্যাবেলা আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। খোকা ঘুমোতে গিয়েছে। ভাল্লু একলা।

উঠোনের চারিধারে ঘর—কোনদিকেই চোখ ছোটাবার উপায় নেই। ভাল্লু যেদিকে তাকায় দৃষ্টি বাঁধা পেয়ে ফিরে আসে। এই হুঃখ ভাল্লুকে আরো কাতর করে তোলে।

কেবল উপর-দিকটা খোলা । মুখ তুললে দেখা যায় তারার চুমকি বসানো নীলাকাশের খানিকটা, আর একখানি বড় চাঁদ।

ভাল্লু দীর্ঘশ্বাস ফেললে কিনা জানি না, কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। চাঁদ দেখলে জীবজন্তুদের মনে কি-রকম ভাবের উদয় হয়, আমার পক্ষে তা বলা অসম্ভব। তবে একট। বিষয় লক্ষ্য করেছি। চাঁদনি রাতে

পথের কুকুরগুলোর চীৎকার বড় বেড়ে ওঠে। কিন্তু কেন? কুকুররা চেঁচিয়ে চাঁদকে কী বলতে চায়?

ভাল্লু কী ভাবছিল? হয়ত সে ভাবছিল যে, হিমালয়ের দিকে গিয়েছে যে-পথ, এই চাঁদ তার উপরেও ফেলেছে রূপোলি আলো। পথের ধারে ধীরে হাওয়ার দোলায় তুলছে নীল বন, চন্দ্রকিরণ জ্বলছে তার পাতায় পাতায়। সেখানে চোখ ছোটে দিকে দিকে মুদুরে, নড়লে-চড়লে বাজে না শিকলের বেসুরো সঙ্গীত। সেখানে যত খুসি ছুটোছুটি কর, কোন পাচিল, কোন বন্ধ দরজা, কোন বাঁধন বাধা দেয় না। ভাবতে ভাবতে ভাল্লুর মনটা কাদো-কাদো হয়ে এল। তার ভাবট তখন বোধহয় এইরকম—

‘স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায়?’

ঐ তো সদর-দরজাটা এখনো খোলা রয়েছে! ঐ দরজার ওপারেই তো স্বাধীনতার পথ । একবার যদি শৃঙ্খল ছিঁড়তে পারি তাহলে আর আমাকে পায় কে? কুকুর-বাঁধা শিকল যে ভাল্লুকের পক্ষে নগণ্য, বাড়ীর কর্তা সেটা খেয়ালে আনেননি।

ভাল্লুর এক টানে ঝনাং করে ছিড়ে গেল শিকল। ভাল্লু মারলে দৌড়। যে-সে দৌড় নয়—যাকে বলে ভোঁ-দেড়ি ।

গ্রাম পার হয়ে মাঠ, মাঠ পার হয়ে বন, বুন পার হয়ে একট। নদী।

ভাল্লু মনের মুখে খানিকক্ষণ নদীতে সাঁতার কাটতে লাগল। তার সাড়া পেয়ে একটা কুমির ভেসে উঠে তদারক করতে এল। ভাল্লু মুখ খিঁচিয়ে তাকে দিলে এক জোর ধমক । শিকারটা সুবিধাজনক নয় বুঝে কুমির আবার ডুব মারলে। এবং ভাল্লুও বুঝলে, যেখানে জলে বেড়ায় প্রকাণ্ড টিকটিকি সে-ঠাঁই মোটেই নিরাপদ নয়। সে তাড়াতাড়ি নদীর ওপারে গিয়ে উঠল।

তারপরেই ভাল্লুর নাকে এল একটা মিষ্টি স্বগন্ধ—অর্থাৎ খাবারের গন্ধ।

এখানেই তার দুর্বলতা। তাকে অনায়াসেই পেটুকচুড়ামণি উপাধি দেওয়া যেতে পারে। নাকে খাবারের গন্ধ এলে সে আর স্থির থাকতে পারে না—তার ভরা পেটেও জেগে ওঠে নতুন ক্ষুধার তাড়ন।

শূন্যে নাক তুলে সে অগ্রসর হতে লাগল। একট। গ্রামে ঢুকল। গ্রামের এক বাড়ীতে আজ বিয়ের ঘটা সাজানো আলোর মালা। লোকজনের ছুটোছুটি ও হাক-ডাক। লুচি-তরকারির গন্ধ।

বাইরের উঠোনে বরযাত্রীর আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। পানতামাক নিয়ে চাকররা আনাগোন করছে। বালকরা ফুলের মালা ও প্রীতি-উপহারের কবিতা বিতরণ করছে। একজন বড় ওস্তাদ তানপুর কাঁধে নিয়ে, কানে এক হাত চেপে মস্ত বড় হাঁ করে পিলেচমকানো তান ছাড়ছেন আর সমঝদাররা তারিফ করে বলছেন, বাহবা-কি-বাহবা! এবং একদল ফাজিল ছেলে মাঝে মাঝে আড়াল থেকে চ্যাঁচাচ্ছে—বাহবা-কি-ছা-ছ্যা!

ভাল্লু কোনদিনই মানুষকে ভয় করত না; কারণ বরাবরই সে দেখে আসছে মানুষরাই তাকে যমের মতন ভয় করে। সুতরাং সে অম্লান বদনে গদাই-লস্করি চালে আসরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

পর-মুহূর্তেই কী যে দক্ষযজ্ঞ ছত্রভঙ্গ কাণ্ড বাধল, সেটা তোমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারবে। বরযাত্রীরা পালাল পায়ের জুতো ফেলে, তানপুরাহীন ওস্তাদজী লম্ব দিলেন ওস্তাদি তান ভুলে, বরকর্তা পালাতে গিয়ে খেলেন ভীষণ আছাড় এবং সেই অবস্থাতেই তাঁর মনে পড়ল ভাল্লুকরা মরা মানুষ ছোয় না, সুতরাং দুই চোখ বুজে ফেলে আড়ষ্ট হয়ে এমন ভাব দেখালেন, যেন তিনি মরে কাঠ হয়ে গিয়েছেন—যদিও মস্ত ভুড়ির হাঁপরের মতন হাঁপানি তিনি বন্ধ করতে পারলেন না। আধ মিনিটের মধ্যেই আসর জনশূন্য ও শব্দহীন।

ভাল্লু দু-একগাছা ফুলের মালা শুকে বুঝলে, সেগুলো খাবার জিনিস নয়। একটা ভরতি চায়ের পেয়ালায় জিভ ডুবিয়ে চাখলে, তাও অখাদ্য বলে মনে হল। তার পরেই তাকে আহবান করলে ভিয়ান-ঘরের লুচি-তরকারির গন্ধ। সেই গন্ধের উৎপত্তি কোথায় জানবার জন্যে ভাল্লু আবার দ্রুতপদে অগ্রসর হল।

অন্দর-মহলের উঠোন। দালানে ঠিক যেন একটি লাল চেলির পুঁটলির পাশে টোপর মাথায় বর-বাবাজী ঘাড় হেঁট করে বসে আছে, পুরোহিত করছে মন্ত্র উচ্চারণ এবং তাদের ঘিরে গয়না ও রংচঙে কাপড়-পরা মেয়েদের ভিড়।

কনের মা বিন্দি-দাসীকে ডেকে বললেন, "ওরে, সদরে গিয়ে দেখে আর তো, ওখানে অত হৈ-চৈ কিসের ?

বিন্দি সদরের দিকে গেল এবং তারপরেই মাটিতে আঁচল লোটাতে লোটাতে দুই চোখ কপালে তুলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল এবং দুম-দাম্ শব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

কনের মা সবিস্ময়ে বললেন, ‘ওরে বিন্দি, কী হল রে, হঠাৎ তুই ক্ষেপে গেলি নাকি?’

বিন্দির জবাব পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু ভাল্লুর দেখা পাওয়া গেল।

পুরুত-ঠাকুর বুড়ো-থুত্থুড়ো হলেও অতি চটপটে, তিড়িং করে লাফ মেরে তখনি চম্পট দিলেন । বর রীতিমত হতভম্ব । তার পাশের পুঁটলিটা আশ্চর্যরকম জ্যান্ত হয়ে উঠল।

বর-কনের পিছনকার দেওয়ালের গায়ে ছিল একটা মস্ত কুলুঙ্গি। কনের বুঝতে দেরি লাগল না যে, এখন লজ্জা করবার সময় নয়। সে টপ করে গাত্রোত্থন করলে এবং ভ্যাবাচ্যাক খাওয়া বরের দুই কঁধে দুই পা দিয়ে উঠে উঁচু কুলুঙ্গিটার

ভিতরে ঢুকে বসল। অন্যান্য মেয়েরা যখন কলরব তুলে উধাও হল, বরও তখন বুঝতে পারলে 'যঃ পলায়তি স জীবতি।'

কিন্তু পালাতে গিয়ে পড়ল গাটছড়ায় টান। বর গাটছড়া ধরে টান মারতেই কুলুঙ্গির ভিতর থেকে কনেও গাঁটছড়ার অন্য প্রান্ত ধরে প্রাণপণে টেনে রইল। বরও ছাড়বে না, কনেও ছাড়বে না—সে এক অপূর্ব 'টাগ-অব-ওয়ার' ।

ভাল্লুর ভাব দেখলে বোধ হয়, এখানে উল্লেখযোগ্য কিছুই যেন হয়নি। খাবারের গন্ধ তাকে ডাক দিয়েছে, কোনদিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করবার সময় তার নেই। ভিয়েন-ঘর খুজে বার করতে বিলম্ব হল না।

সেখানেও হল আর-এক দফা হাঁউ-মাউ, হুটোহুটি, ছুটোছুটি, লুটোপুটির পালা। তারপর সব ঠাণ্ডা।

ভাল্লু তখন মনের সাধে বেছে বেছে খাবার খেতে বসল।

খেতে খেতে যখন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তখন বাড়ীর ভিতরে কোথায় উপরি-উপরি দুইবার গুড়ুম্ গুড়ুম করে বেজায় আওয়াজ হল ।

ভাল্লু চমকে উঠল। ওরে বাবা, এখানেও নতুন রকম লাঠির গোলমাল? মানুষগুলো কি পাজি, খেয়ে-দেয়ে যে একটু জিরিয়ে নেৰ তারও জো নেই।

ভাল্লু হস্তদন্তের মত সেখান থেকে সরে পড়ল।

বনের বাঘা

জ্বালালে রে, ভারি জ্বলালে! যেখানে যাব, সেখানেই ঐ নতুন রকম লাঠি গুড়ুম-গুড়ুম করে আক্কেল গুড়ুম করে দেবে?

ভাল্লু পাই-পাই করে ছুটতে লাগল। অত বড় আর ভারি দেহ নিয়ে কী করে যে সে অত তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারে, ভাবলেও অবাক হতে হয় ।

আবার গ্রামের পর গ্রাম, বনের পর বন, মাঠের পর মাঠ, নদীর পর নদী । মাথার উপরে সোনার চাঁদ খালি হাসে আর হাসে, পরীদের উড়ন্ত ফানুসের মতন জোনাকীরা টিপ টপ করে জ্বলতে জুলতে উড়ে যায়, মাঝে মাঝে 'কা-হুয়া, কা-হুয়া' বলে চেঁচিয়ে শেয়ালরা খবরদারি করতে আসে।

স্বাধীনভাবে পথ চলার আনন্দে ভাল্লুর মন যখন রীতিমত মেতে উঠেছে, বনের ঝোপ নেড়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল হামদোমুখে বাঘা।

ভাল্লু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাঘা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল। ভাল্লুও আড়চোখে তাকে দেখে নিয়ে বুঝে ফেললে, এ জীবটিকে বৈষ্ণব বলে সন্দেহ হয় না।

বাঘা দু-পা এগিয়ে এল। ভাল্লু বললে, 'ঘোৎ? ('কে তুমি ?)

বাঘা মাটিতে ল্যাজ আছড়ে বললে, "গরর গরর গরর ।' ('আমি বাঘা । তোমার ঘাড় মটকাতে চাই।)

মাটিতে আছড়াবার মতন ল্যাজ ভাল্লুর ছিল না। তবু বাঘাকে ভড়কে দেবার জন্যে একটা কিছু করা উচিত বুঝে সে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনের দুই থাবা মেড়ে নেড়ে বললে, 'ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ' ('মট করে মটকাবার মতন ঘাড় আমার নয়। তফাতে সরে যা হতভাগা?)

বাঘা মনে মনে তারিফ করে বললে,—এই কুকুরমুখে ধিঙ্গিটা আমার ওপরে বেশ এক হাত নিলে দেখছি। আমি ল্যাজটা আছড়াতে পারি বটে, কিন্তু আমার পক্ষে এমন মানুষের মতন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব –প্রকাশ্যে বললে, 'হালুম্ হুলুম, হালুম হুলুম।'

ভাল্লু বললে, 'ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক।'

বাঘা বললে, 'রক্ত খাব।'

ভাল্লু বললে, 'থাবড়ে বদন বিগড়ে দেব !'

—'আও, আও!'

—'নিকালো হিঁয়াসে?'

—'হোঁদল-কুতকুতে।'

—'থ্যাবড়ানাকী চেরণদাতী!'

তারপর বাক্যযুদ্ধের পালা সাঙ্গ। ভাল্লুর ঘাড়ে পড়বার জন্যে বাঘা মারলে লাফ—ভাল্লু গেল চট করে একপাশে সরে। বাঘ মাটিতে পড়েই ফিরে ঘ্যাঁক করে ভাল্লুর পিছনে কামড়ে দিলে। ভাল্লুও ফিরে বাঘার মুখে মারলে ধা করে এক থাবড়া।

ভাল্লুর পিছনে ছিল পুরু লোম, বাঘার কামড়ে তার কিছুই হল না। কিন্তু ভাল্লুর থাবড়ায় বাঘার বাহারি মুখের যে দুর্দশা হল তা আর বলবার নয়।

তখন অরণ্য-রাজ্যের প্রজার চারিপাশে এসে জড়ো হয়েছে মজা দেখবার জন্যে। শিয়াল, বনবিড়াল, সঞ্জারু এবং গাছের ডালে লাঙ্গুল ঝুলিয়ে তিনটে হনুমান। এমন কি একটা ভীতু খরগোসও গর্তের ফাঁক দিয়ে একবার উঁকি না মেরে থাকতে পারলে না । মজা দেখতে এল না কেবল হরিণরা।

এর আগে বাঘা কোনদিন ভাল্লুক দেখেনি, কারণ ভাল্লুকরা এ বনে বসবাস করত না। আজ প্রথম ভাল্লুকের পরিচয় পেয়ে সে দস্তুর মত হতভম্ব হয়ে গেল।

ভাল্লু বললে, 'ভায়, আর একহাত লড়াই করবে নাকি?

বাঘার গা যেন জ্বলে গেল । কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে সে আবার ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

শেয়ালরা সুধোলে, "কা-হুয়া, কা-হুয়া?

"কুছ নেহি হুয়া" বলে ভাল্লু আবার চলতে সুরু করলে।

চাঁদের আলোয় ধবধব, করছে বনের পথ। পাপিয়ারা মেতেছে গানের জলসায়। নিঝুম রাতের কানে কানে বাতাস বাজাচ্ছে সবুজ পাতার বীণা। পথের শেষে ঘাস-বিছানায় শুয়ে একটি নদী কলতানের ছন্দে গাঁথছিল হীরার মালা।

ভাল্লুর তেষ্ট পেয়েছে। সে নদীর ধারে গিয়ে চুক-চুক করে জলপান করছে, এমন সময় এখানেও একটা কুমির তার সঙ্গে আলাপ করতে এল। কিন্তু ভাল্ল জলে নামলে না । সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, আলিপুরের চিড়িয়াখানায়, মানুষদের ঘরের দেওয়ালে আমি তো অনেক টিকটিকি দেখেছি, কিন্তু জলের টিকটিকিগুলো এত বড় হয় কেন?

কুমিরটা প্রায় তীরের কাছে এসে বললে, 'ভাল্লুক ভায়া, একবার জলে নামো না হে ! তোমার সঙ্গে দুটো মনের কথা কই?

ভাল্লু বললে, 'না হে ধুমসে টিকটিকি, আমার সময় নেই।

—'এত ব্যস্ত কেন? কোথা যাও ?'

—'ক্ষিধে পেয়েছে। বটতলায় চললুম বটফল কুড়িয়ে খেতে।'

কালুয়া-সুন্দরী

বটগাছের ঝিলমিলে পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদ হাসিমুখে উঁকি মেরে দেখলে, ভাল্লু মনের সাধে কুড়িয়ে খাচ্ছে মাটির উপর ঝরে-পড়া বটের ফল।

তারপর চাঁদ নিলে ছুটি। সমস্ত পৃথিবী পড়ল অন্ধকারের ঢাকনা চাপ,—শুন্যে জেগে রইল খালি তারা-ছড়ানো আকাশের মায়াময় আবস্থায়।

ভাল্লুর ঘুম পেলে। নরম বিছানার খোজে সে একটা ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে তার আগেই ঢুকে ঘুমোচ্ছিল একটা মস্ত গোখরো সাপ, ভাল্লুর সাড়া পেয়ে সে কালে বিদ্যুতের মত মাথা তুলে বলে উঠল, ফোস, ফোঁস্! রোস তো, রোস তো,—দেখবি মজা—রোস তো, রোস তো! ফোঁস সাপ মারলে ছোবল, কিন্তু তার আগেই চটপটে ভাল্লু চালালে থাবা, গোখরোর বিষ-দাঁত শুদ্ধ মুণ্ডু গেল কোথায় উড়ে। ভাল্লু একটু তফাতে গিয়ে থেবড়ি খেয়ে বসে দেখতে লাগল, গোখরোর মুণ্ডহীন লটপটে ধড়টা ক্রমাগত পাকসাট মারছে আর পাক খাচ্ছে। ভাল্লু অবাক হয়ে ভাবলে, এ কি রকম জানোয়ার রে বাবা। মাথা না থাকলেও মরবার নাম করে না! আবার তেড়ে কামড়াতে আসবে নাকি? দরকার নেই এখানে ঘুমিয়ে, অন্য ঝোপে যাওয়া যাক।

পুব-আকাশে রামধনু-রঙের খেলা দেখে পাখিরা খুসি হয়ে ঘুমভাঙানিয়া তান সাধতে লাগল, কিন্তু ভাল্লুর ঘুম তবু ভাঙল না। গেল রাতে তার কম খাটুনি হয়নি তো, স্বপ্নলোক থেকে সে সহজে ফিরে আসতে রাজি হল না।

বেলা বাড়ছে, চাষার মাঠে মাঠে লাঙল চষছে, ক্ষেতের আশপাশ দিয়ে হাটের লোক আনাগোনা করছে।

হঠাৎ কোত্থেকে বাজল কার ডুগডুগির ডিমি-ডিমি ভাল্লু চমকে জেগে উঠল। কান খাড়া করে শুনলে ডুগডুগির বাজনা । ভাবলে, কে বাজায় এখানে এ বাজনা?

ডুগডুগির সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছে মানুষদের উল্লাস-ধ্বনি ও হাততালির শব্দ। এই উল্লাস-ধ্বনি ও ডুগডুগির ভাষা যে ভাল্লুর কাছে অত্যন্ত পরিচিত। পথে পথে ডুগডুগির তালে তালে কত নাচের আসর সে যে মাত করে দিয়েছে, তা কি ভোলবার কথা? ভাল্লুর মনটা আনচান করতে লাগল। কথায় বলে, 'চড়কে-পিঠ ঢাকে কাটি পড়লেই সড়-সড় করে ওঠে, ভাল্লুর অবস্থাও হল তাই। নিজেকে সে একজন উঁচু-দরের নৃত্যশিল্পী বলে জানে, সুতরাং ডুগডুগির ছন্দ শুনে আর স্থির থাকতে পারলে না। ধড়মড় করে উঠে বসে ঝোপের ফাঁক দিয়ে সাবধানে একটুখানি মুখ বাড়ালে।

খানিক তফাতেই নদীর ধার দিয়ে নদীরই মতন এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে হাটের পথের রেখা। পথের পাশে প্রকাণ্ড একটা অশত্থগাছ এবং তারই ছায়ার নীচে জমেছে লোকের ভিড়। সেইখানে ডুগডুগি বাজিয়ে একটা লোক দেখাচ্ছে ভাল্লুক-নাচ। যে ভাল্লুকটা নাচছে সে ভাল্লুর মতন জোয়ান মস্ত-বড় নয় বটে, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়, তারা দুজনেই হচ্ছে একই জাতের জীব।

চাঙ্গা হয়ে উঠল ভাল্লুর শিল্পী-প্রাণ। সে মাথা তুলে, মাথা নামিয়ে, এপাশে-ওপাশে মাথা কাত করে—নানানভাবে দস্তুরমত সমালোচকের দৃষ্টিতে নতুন ভাল্লুকটার নাচ খানিকক্ষণ ধরে দেখে বেশ বুঝে ফেললে, এ এখনো নৃত্যকলার ছাত্র মাত্র—তার মতন উচ্চশ্রেণীতে উঠতে, এর এখনো অনেক দিন লাগবে।

ভাল্লু মনে মনে ভাবলে, বোকা মানুষগুলো এই বাজে নাচ দেখেই এত হাততালি আর বাহবা দিচ্ছে, সেরা আর্ট কাকে বলে নিশ্চয় এরা তার খবর রাখে

না ! ঝোপ থেকে বেরিয়ে একবার দেখিয়ে দেব নাকি আমার পায়ের কায়দা?...ধেই-ধেই করে নাচবার জন্যে তার দুই পা যেন নিসপিস করতে লাগল।

নাচ দেখতে দেখতে ভাল্লু হঠাৎ আর-একটা আবিষ্কার করে ফেললে । যে নাচছে, সে তার মতন পুরুষ নয়—সে হচ্ছে ভলুকী।

সঙ্গে সঙ্গে ভাল্লুর মত গেল বদলে। মনে মনে সে বললে, 'আহা মরি মরি, ভলুকীর কী সুন্দর দেহের গড়নটি। মাঝে মাঝে নাচের তাল কেটে যাচ্ছে বটে—তা একটু-আধটু তাল অমন কেটেই থাকে, কিন্তু কী চমৎকার ওর নাচের ধরনটি। ওগো ভাল্লুক-মেয়ে, তুমি হিমালয়ের কোন বনের ঋক্ষরাজকুমারী? কোন পামর মানুষ তোমাকে বাপ-মায়ের আদর-ভরা কোল থেকে ছিনিয়ে এনে এমন পথের ধুলোয় নামিয়েছে? হায় হায়, কত কষ্টই পাচ্ছ না জানি !

হঠাৎ বোধহয় নাচের তাল বেশিরকমই কেটে গেল, ভাল্লুকওয়াল লাঠি তুলে ভল্লুকীর উপরে ঠকাস করে এক ঘাঁ বসিয়ে দিলে । ভল্লুকী কেঁদে উঠল, তার কান্নার আওয়াজ শাখের ডাকের মত।

ভাল্লুক-মেয়ের গায়ে হাত তোলা? এ নিদারুণ দৃশ্য ভাল্লু সহ্য করতে পারলে না, ভয়ঙ্কর এক গর্জন করে সে একেবারে ঝোঁপের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল। যারা একমনে নাচ দেখবার আমোদে মেতেছিল, সেই ভয়ঙ্কর গর্জন শুনে বেজায় চমকে তারা ফিরে দেখে, ঝোপ ভেদ করে ছুটন্ত বিভীষিকার মত আবির্ভূত হয়ে একটা সুবৃহৎ ভাল্লুক বেগে তেড়ে আসছে তাদের দিকেই। গ্রামের প্রান্তে প্রকাশ্য দিবালোকে এমন অসম্ভব ব্যাপার কল্পনাতীত বলে প্রথমটা নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে না পেরে দু-এক মুহূর্ত সকলে দাঁড়িয়ে রইল হতভম্বের মত ; এবং তারপরেই হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে যে যেদিকে পারলে টেনে লম্ব দিলে ।

ভাল্লুকওয়ালাদের ব্যবসা ভাল্লুক নিয়ে, কাজেই প্রথমটা সে ভয় পেয়ে সেখান থেকে নড়তে রাজি হল না।

কিন্তু ভাল্লু যখন কাছে এসে মানুষের মতন দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, সামনের দুই পায়ের নখ বার করা ধাবা বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হল তখন ভলুকীর বাঁধন-দড়ি ছেড়ে বিকট চীৎকার করে সেও দিলে চোঁ-চোঁ চম্পট।

ভাল্লু খানিক দূর পর্যন্ত ভাল্লুকওয়ালার পিছনে পিছনে তাড়া করে গেল। তারপর ফিরে আবার গদাইলস্করি চালে ভলুকীর দিকে আসতে লাগল।

ইতিমধ্যে ভল্লুকী মাটিতে চার থাবা পেতে বসে চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে ভাল্লুকে ভালো করে দেখে নিয়েছে এবং বলতে কি— তাকে তার পছন্দও হয়েছে ।

ভাল্লু কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আবার কিছুক্ষণ ধরে ভল্লুকীকে মুগ্ধ চোখে নিরীক্ষণ করলে। তারপর এগিয়ে ভল্লুকীর ঠাণ্ডা নাকে নিজের ঠাণ্ডা নাক ঘসে মধুর স্বরে বললে, 'ঘোঁৎ ঘোঁৎ?

ভল্লুকীও লজ্জিত চোখ নামিয়ে মেয়েলি মিহি গলায় বললে, 'ঘোৎ-ঘোঁৎ!'

তারপর তাদের দুজনের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হল, আমার বিশ্বাস তা হচ্ছে এইরকম:

ভাল্লু বললে, 'ওগো রাজকন্যে, তোমার নাম কী, তোমার বাসা কোন বনে?

ভল্লুকী মাছি তাড়াবার জন্যে গা-ঝাড়া দিয়ে বললে, 'জানি না। জ্ঞান হবার আগেই উমুনমুখো মানুষরা আমাকে ধরে এনেছে।'

—'মানুষরা তোমার কোন নাম রাখেনি?

—'ওমা, তা আবার রাখেনি ! মানুষরা আমাকে কালুয়া বলে ডাকে?

—'কলুয়া ! আ মরি মরি, কী মিষ্টি নাম!' ভাল্লু দুই চোখ মুদে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল।

ভল্লুকী খুসি হয়ে সুধোলে, 'বীরবর, তোমার নামটি তো শোনা হল না।'

ভাল্লু ভরাট গলায় বললে, "আমার নাম ভাল্লু? —

'ভাল্লু? হু, যোদ্ধার মতন নামই বটে ..ঘ্যাঁক, ঘ্যাঁক —ঘ্যাঁক?

—'ওকি?'

—'একঝাঁক মাছি গো। তিনটেকে খেয়ে ফেলেছি। বাকিগুলো ভারি জ্বালাচ্ছে।'

ভল্লুকীর মন রাখবার জন্যে ভাল্লু তখন মক্ষিকাদের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল । খামিকক্ষণ চেষ্টার পর বললে, 'নাঃ, অসম্ভব! কাল আমি বনের বাঘের সঙ্গেও যুদ্ধে জিতেছি কিন্তু পাজির পা-ঝাড়া এই উড়ন্ত শত্রুগুলো ধরাই দেয় না, যুদ্ধ করব কী? এক বেটা আবার আমার কানে ঢুকে "বোঁ বোঁ" বলে গান গাইছে । রাজকন্যে, এখান থেকে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ ।

দুজনে হন-হন করে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে ভলুকী বললে, 'ক্ষিধের চোটে আমার নাড়ী চোঁ-চোঁ করছে।'

ভাল্লু বললে, 'বটফল খেতে চাও তো ঐ বটতলায় চল। বটফল খেতে খেতে ভলুকী বললে, 'হ্যাঁ গো, তুমি অমন ছট্‌ফট, করছ কেন?"

—'বললুম তো কানে ঢুকেছে মাছি।'

—'কই, দেখি?'

ভাল্লু শুয়ে পড়ে মুখ কাত করে রইল। ভল্লুকী তার কানের কাছে নিজের নাক নিয়ে গিয়ে হুসহাস করে ছাড়তে লাগল প্রচণ্ড নিশ্বাস। মাছিটা টুপ করে বেরিয়েই ভলুকীর বদন-বিবরে ঢুকে পড়ল ।

ভাল্লু কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, 'কালুয়া সুন্দরী, তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ?'

ভল্লুকী আনন্দে গদগদ হয়ে হেলে-তুলে বললে, 'রাজি।'

ব্যস, তাদের বিয়ে হয়ে গেল। মানুষের বিয়ের মতন জানোয়ারদের বিবাহ ব্যাপারে লক্ষ কথা, পুরুত, মন্ত্র, বরপণ ও আরো হাজার ঝঞ্ঝাটের দরকার হয় না-এ একটা মস্ত সুবিধা ।

ঠিক এমনি সময়ে দূরে উঠল একটা গোলমাল। নতুন বর-বউ চমকে ফিরে দেখে, শত শত লোক আকাশ ফাটানো চীৎকার করতে করতে মাঠ দিয়ে ঝড়ের মতন ছুটে আসছে এবং সকলের আগে আগে আসছে সেই ভাল্লুকওয়ালা।

ভল্লুকী ভাল্লুর পেটের তলায় মুখ গুজে সভয়ে বললে, 'ওমা, কী হবে গো"

ভাল্লু পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সদম্ভে বললে, 'কুছ পরোয় নেহি। মাছির মতন কানের মধ্যে ঢুকে ওরা বোঁ-ও-ও বলে গান গাইতেও পারে না । যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি।'

ভল্লুকী সাহস পেয়ে বললে, 'বীরবর তুমিই ধন্য? গুড়ুম গুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ হল। ভাল্লু বিনা বাক্যব্যয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে চার পায়ে দৌড়তে আরম্ভ করলে।

ভল্লুকী বললে, "তুমি কি ওদের আক্রমণ করতে যাচ্ছ?"

—'পাগল, আমি পালাচ্ছি।"

—"সে কী গো, আমাকে ফেলে?"

—"উপায় কী গিন্নি, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আমি নতুন রকম লাঠির শব্দ শুনেছি, আর কি এখানে থাকি?"

নদীর ধারে গিয়ে ভাল্লু ফিরে দেখলে, ভলুকী তার সঙ্গ ছাড়েনি। খুসি হয়ে বললে, "এই যে, তুমিও এসেছ, ভালোই হয়েছে। এখন জলে ঝাপ দাও তো দেখি ! কিন্তু সাবধান, ধুমসে টিকটিকিকে কাছে ঘেঁষতে দিও না?"

—"ধুম্‌সে টিকটিকি আবার কে?"

জলে ঝাঁপ খেয়ে ভাল্লু বললে, ঐ দেখ?

কিন্তু কুমির-ভায়া হাঁদা-গঙ্গারাম নয়। একসঙ্গে ডবল ভাল্লুক দেখে সে ডুব মেরে অন্যদিকে চলে গেল।

কালুসর্দার ও টুনু-ঝুনু

ভাল্লু সাঁতার কেটে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে দেখলে, ভল্লুকী তার পিছনে নেই, কখন জল থেকে উঠে গিয়ে চুপ করে ডাঙার উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাল্লু চীৎকার করে তাকে ডাকলে।

কিন্তু ভাল্লুকী তবু সাড়া দিলে না।

ভাল্লু বুঝলে, নদীর জলে ধুম্‌সে টিকটিকিকে দেখে ভলকী ভয়ে ভড়কে গিয়েছে। বউকে অভয় দেবার জন্যে ভাল্লু যখন ফিরব ফিরব করছে, তখন আবার গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ, এবং সে করে কি একটা জিনিস এসে ভাল্লুর ঠিক পাশ দিয়ে জলের উপরে ছোঁ মেরে চলে গেল ।

ভাল্লু বোকা নয়। নতুন রকম লাঠির চীৎকার শুনেই কালুয়াসুন্দরীর কথা ভুলে সে বেগে সাঁতার কাটতে শুরু করলে। মিনিট কয় পরে ওপারে গিয়ে উঠে ফিরে দেখলে, ভাল্লুকওয়ালা এসে আবার কালুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাল্লু ধরলে বনের পথ।

নয়নপুরের জমিদারের নাম প্রশান্ত চৌধুরী। তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে। তাদের ডাকনাম টুনু ও ঝুনু ।

ঝুমু হচ্ছে দিদি, বয়স ছয় বৎসর। টুমুর বয়স চারের বেশী নয়।

ঝুমু একেবারে পাকা গিন্নিটি, এই বয়সেই তার নাকি কিছুই জানতে বাকি নেই। সে জানে আকাশের তারারা হচ্ছে চাঁদামামার খোকা-খুকি। ফুলপরীরা রাত্রে যেসব ফানুস উড়িয়ে দেয়, মানুষরা যে তাদেরই জোনাকি বলে ডাকে এ বিষয়েও ঝুনুর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। ঝুনু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে বনগাঁবাসী মাসি-

পিসির বাড়ীতে গিয়ে নিমন্ত্রণ খেয়ে আসে, তারপর সকালে সেখানকার গল্প বলে টুনুকে অবাক করে দেয় ।

আজ সে হঠাৎ বললে, 'টুনু, হরিণ দেখেছিস?'

—'না।'

—'হরিণরা কোথায় থাকে জানিস?'

—'উহু।'

—'বনে।'

—'কোন বনে?'

—'মাঠের ওপারে যে বনটা দেখা যাচ্ছে, ঐ বনে।'

টুনু বললে, 'আমি হরিণ দেখব।'

ঝুমু বললে, 'হাঁটতে পারবি?'

—'হুঁ-উ-উ।'

—'তবে আয় আমার সঙ্গে।'

তেপান্তর মাঠ। যেখানে বনরেখা দেখা যাচ্ছে সেখানে যেতে মাইল তিনেক পথ পেরুতে হয়। পায়ে হাঁটা মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চলল ঝুনু আর টুনু।

মাইল খানেক পথ চলতে না চলতেই টুকু বসে পড়ে বললে, 'দিদি, আমায় কোলে নে।'

ঝুমু কী আর করে, টুনুকে কোলে তুলে নিলে। কিন্তু চার বছরের খোকাকে কোলে নিয়ে ছয় বছরের খুকি আর কতক্ষণ পথ চলতে পারে? খানিক পরেই হাঁপিয়ে পড়ে ঝুমুও পথের উপরে বসে পড়ল।

এমন সময়ে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করল কালাচাঁদ মণ্ডল বা কালুসর্দার। সে হচ্ছে এ অঞ্চলের চোর-ডাকাতদের দলপতি। প্রথমেই তার শিকারী চোখ পড়ল ঝুমুর গলার সোনার হার ও হাতের সোনার চুড়ির উপরে।

কালু গলার আওয়াজ যথাসাধ্য নরম করে সুধোলে, 'তোমরা কাদের খোকা-খুকি গো?'

ঝুনু বললে, 'আমার বাবা জমিদারবাবু।'

—'এখানে কেন?'

—'ঐ বনে যাব।'

—'বনে গিয়ে কী করবে খুকুমনি?'

—'হরিণ দেখব।'

—'ও, তাই নাকি? তা হরিণ তো ও-বনে থাকে না?'

—'হরিণ তবে কোথায় থাকে শুনি?'

খানিক দূরের একটা জঙ্গল দেখিয়ে কালু বললে, 'ওখানে অনেক হরিণ আছে। দেখবে?'

—'দেখব বলেই তো এসেছি?'

—'এস, তবে আমার কোলে ওঠ।'

ঝুনু আর টুনুকে নিয়ে কালু জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হল।

এখন, সেই জঙ্গলেরই ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল আমাদের ভাল্লু। একটা ঝুপসি ঝোপের তলায় ঢুকে সে তখন ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ তার কানে গেল শিশুর কান্না।

ব্যাপারটা তদারক করবার জন্যে ভাল্লু ধড়মড় কবে উঠে দাঁড়িয়ে ঝোপের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে দিলে।

কালু তখন এক হাতে ঝুমুকে মাটির উপরে চেপে ধরে আর এক হাতে তার গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নিচ্ছে।

আগেই বলেছি আমাদের ভালু প্রত্যেক খোকা-খুকিকে বন্ধু বলে মনে করত। এতটুকু একটি খুঁকির উপরে এমন বিষম অত্যাচার সে সহ্য করতে পারলে না। ভয়ানক গর্জন করে তেড়ে গিয়ে কালুকে মারলে প্রচণ্ড এক চড়। কালু আর্তনাদ করে ঠিকরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

কালুর কবল থেকে মুক্তি পেয়েও ঝুনু ও টুনুর পিলে গেল চমকে। সামনে তাদের প্রকাণ্ড এক ভালুক! সে আবার চড় মেরে মানুষকে রক্তাক্ত করে দেয়। তারা দুজনেই কেঁদে উঠল ।

ভালু বুঝলে, তাকে দেখে শিশুরা ভয় পেয়েছে। সে তখন তুই পায়ে ভর দিয়ে ধেই-ধেই করে নাচতে আরম্ভ করলে—কারণ বরাবরই সে দেখে আসছে, তাকে নাচতে দেখলেই শিশুরা হেসে উঠে খুসি হয়ে হাততালি দেয় ।

যা ভেবেছে তাই! ভালুক-নাচ দেখেই ঝুনু আর টুনু কান্না ভুলে গেল।

খানিক্ষণ নাচানাচি করে ভালু মাটির উপরে লম্ব হয়ে শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিতে দিতে ঝুনু আর টুনুর পায়ের কাছে গিয়ে, চার থাবা তুলে একেবারে স্থির হয়ে রইল ।

টুমুর মনে হল, ভানু যেন মিটমিট করে তাদের পানে তাকিয়ে হাসছে। সে ভয়ে ভয়ে ভালুর গায়ে হাত দিলে, ভালু তবু নড়ল না। ঝুনু তখন সাহস সঞ্চয় করে তার গায়ে একবার হাত বুলিয়ে নিলে, ভালু তখনও আড়ষ্ট।

ঝুনু বললে, “ভাল্লুকটা ভারি ভালোমানুষ রে! টুনু বললে, “একে আমি পুষব।”

জমিদার বাড়ীতে তখন হুলুস্থলু পড়ে গিয়েছে –ঝুমু ও টুনুর অন্তর্ধানে.চারিদিকে উঠেছে খোঁজ খোঁজ রব।

জমিদার প্রশান্ত চৌধুরী অনেক লোকজন নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন। সঙ্গে আছে তার বাল্যবন্ধু নবীনবাবু। তিনি আলিপুর চিড়িয়াখানার একজন পদস্থ কর্মচারী, ছুটি পেলে মাঝেমাঝে এখানে বেড়াতে আসেন।

একজন লোকের মুখে শোনা গেল, ঝুনু ও টুনুকে দেখা গিয়েছে মাঠের ধারে।

তারপর মাঠের এক চাষী খবর দিলে, কালুসর্দার দুটি শিশুকে কোলে করে নিয়ে গিয়েছে জঙ্গলের দিকে।

ডাকাত কালুসর্দার? প্রশান্তবাবুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। দলবল নিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটলেন তিনি পাগলের মত।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দেখা গেল এক দৃশ্য-যেমন ভয়াবহ, তেমনি অদ্ভুত।

একদিকে মাটির উপরে পড়ে রয়েছে কালুর রক্তাক্ত ও অচেতন দেহ, হাতে তার ঝুনুর সোনার হার। আর একদিকে হেলে-ফুলে পায়চারি করছে বিরাট এক ভালুক, পিঠে তার বসে রয়েছে ঝুনু ও টুনু।

টুনু সকৌতুকে বলছে, "হট হট, ঘোড়া, হট হট, জোরসে চল, জোরসে চল।'

নবীনবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'আরে, এ যে আমাদের চিড়িয়াখানার সেই ভালুকটা! আজ কদিন হল পালিয়ে এসেছে!

ভালু বেগতিক দেখে ঝুনু ও টুনুকে পিঠে করেই চম্পট দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু এবার সে আর ফাঁকি দিতে পারলে না, মানুষের উপকার করতে গিয়ে আবার মানুষের হাতেই বন্দী হল।

ঝুমুর মুখে সমস্ত শুনে প্রশান্তবাবু কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন, "এই ভালুকটি আমার ছেলে-মেয়ের প্রাণরক্ষা করেছে। একে আমি যত্ন করে বাড়ীতে রেখে দেব।'

নবীনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব। এই ভালুকটি হচ্ছে সরকারের সম্পত্তি । ওকে আবার যেতে হবে চিড়িয়াখানায়।'

হায় ভাল্লু! হায় রে হিমাচলের স্বপ্ন!